প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রকাশক
প্রিয়ব্রত দেব
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বি, বেলেঘাটা রোড
কলকাতা-৭০০০১৫

সূচীপত্র

চিত্রপরিচিতি



মুখবন্ধ

'কুন্‌স্ট্ হিন্টার স্টাখেলড্রাহ্‌ট্' শিল্পচর্চা বিষয়ক গ্রন্থ। অবিশ্বাস্য এক পরিস্থিতিতে নারকীয় পরিবেশে অসামান্য এক শিল্পচর্চার কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। সভ্যতার ইতিহাসে মাত্র একবারই সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পচর্চার এমন ক্ষেত্র এবং বিশ্বের সর্বত্র প্রতিটি সভ্য মানুষ আজও নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন, দ্বিতীয়বার যেন তেমন ক্ষেত্র সৃষ্টি না হয়।

উলফগাং স্নাইডার তাঁর গ্রন্থের যে নামকরণ করেছেন আক্ষরিক অনুবাদে তার অর্থ দাঁড়ায় 'কাঁটাতারের পেছনের শিল্প।' আমরা কিছু স্বাধীনতা নিয়ে নাম দিয়েছি 'মৃত্যুশিবিরের শিল্প'।

জার্মানিতে ক্ষমতা দখলের মুহূর্ত থেকেই হিটলারের প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল কেমন করে, কত দ্রুত বিরোধীপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা যায়, যাবতীয় বিরোধীপক্ষ—দলের মধ্যে ও বাইরে, দেশের ভেতরে ও বাইরে, জাতির ভেতরে ও বাইরে--যারাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, যারাই তার যুদ্ধপ্রস্তুতির বিরুদ্ধে। সাধারণ জেলখানা, ফাঁসির মঞ্চ, ছুরি, রাইফেল এবং বধ্যভূমি হিটলারের চাহিদা মেটাতে পারে না। তাই গড়ে তোলা হয় একটার পর একটা কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প এবং এক্‌স্‌টার্মিনেশন সেন্টার, বন্দীশিবির এবং গণহত্যার কেন্দ্র। প্রথমে জার্মানির সীমানার মধ্যে, তারপর জার্মানির পদানত

প্রতিটি দেশে। প্রথমে কমিউনিস্ট আর ইহুদিদের জন্যে তারপর গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন সমস্ত দেশপ্রেমিকেব জন্যে। গ্যেটের স্মৃতিজড়ানো এটেসবার্গ পাহাড়ের ওপর, ভাইমার শহরের প্রান্তে এমনি এক শিবির বুখেনওয়াল্ড।

উনিশশ সাঁইত্রিশের জুলাইয়ে গড়ে ওঠে বুখেনওয়াল্ড বন্দীশিবির, জার্মান বন্দীদের জন্যে। যুদ্ধ-শুরু থেকে উনিশশ পঁয়তাল্লিশের এগারই এপ্রিল শিবিরের পতন ঘটা বত্রিশটি জাতির হাজার হাজার বন্দীকে নরকের জীবনযাপন করতে হয় এখানে। মুক্তি ছিল শুধু মৃত্যুতে।

সেই নরকেও মনুষ্যত্ব হার মানে নি। মানুষ ত ততক্ষণই মানুষ যতক্ষণ সে মানুষের মত আচরণ করে। অথচ নাৎসিরা নিখুঁত পরিকল্পনায় এবং নির্মম পরিচালনায় এইসব শিবিরের বন্দীদের ক্রমাগত টেনে নামাচ্ছিল পশুত্বের স্তরে, প্রতিদিনের জীবনযাপনে, ক্ষুধা, রোগ, নিপীড়ন, মৃত্যু এবং সর্বোপরি ত্রাস আর আতঙ্ক দিয়ে। মানুষ তবু হার মানে নি, মনুষত্ব পরাজিত হয় নি। নম্রভাবে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলেছে, 'কমপেল্‌ড্ বাট নট কংকার্ড!'

মনুষ্যত্বের এই সংগ্রামে মন্ত্রের বল নিয়ে কাজ করেছে শিল্প আর শিল্পচর্চা। সেই নরকে প্রতিটি মুহূর্ত যখন পশুত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় জীবনকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করেছে, বন্দীরা তখন ছবি এঁকেছেন, খোদাই করেছেন, কবিতা লিখেছেন, গান বানিয়েছেন, সুর দিয়েছেন, সেই সুরে গান গেয়েছেন, বাজনা বাজিয়েছেন এবং দাঁতে দাঁত চেপে সমগ্র পরিবেশকে পরাজিত করে হয়ে উঠেছেন মানুষ। মানুষই থেকেছেন। 'মৃত্যুশিবিরের শিল্প' বুখেনওয়াল্ডের সেই অলৌকিক শিল্পচর্চার কাহিনী। স্নাইডার এখানে ততটা লেখক নন যতটা সংকলক। গ্রন্থ জুড়ে আছে বুখেনওয়াল্ড বন্দীদের, বন্দী-শিল্পীদের সাক্ষ্য, বিবৃতি আর জবানবন্দী।

উনিশশ পঁচাশি আর ছিয়াশি সালে দুদফায় প্রায় বছরখানেক ইওরোপে থাকার সুযোগ হয়ে যায়। সে সময় পুবে এবং পশ্চিমে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করলেও মূল ঘাঁটি ছিল অ্যালবার্ট হোয়েসলার স্ট্রাসে-র আস্তানায়, বার্লিনে, গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের (অনেকেই যাকে পূর্ব জার্মানি বলেন) রাজধানীতে। মালবিকা তখন প্রায় পাকাপাকিভাবে থাকে সেখানে। সে তখন বিশ্ব গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি।

দু-দফায় পুবে এবং পশ্চিমে বেশ কয়েকটা বন্দীশিবির দেখা যায়। বার্লিনের কাছেই সাকসেনহাউসেন আর রাভেন্সব্রুক। শুধুমাত্র নারীদের বন্দীশিবির রাভেন্সব্রুক ছিল নরকেরও নরক। ইটালি থেকে ফেরার পথে মিউনিখ হয়ে ডাখাউ। আমাদের দুই পোলিশ বন্ধু ভালদেমার এবং তাদেউশ ধরে নিয়ে যায় তাদের শহর ক্র্যাকোফ-এ। সেখান থেকে আমরা চলে যাই কুখ্যাত আউশউইৎজ এবং বির্কেনাউ-এ। রাভেন্সব্রুক-এর মত বির্কেনাউ-ও ছিল শুধু মেয়ে বন্দীদের শিবির। তারপর একসময় জি ডি আর-এর বন্দর উর্নামুন্ডে থেকে উত্তর সাগর পার হয়ে ডেনমার্কে। সেখানকার বন্দীশিবিরের স্মৃতি এখন যাদুঘরে। আর বাববার দেখা হয় বুখেনওয়াল্ড। কখনো মালবিকার সঙ্গে, কখনো বা মালবিকার অন্তরঙ্গ জার্মান দম্পতি রাহেল ও আর্নস্ট্ স্প্রিংগারকে সঙ্গে নিয়ে।

যতবার বুখেনওয়াল্ডে গেছি প্রত্যেকবার অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটেছে। কথা নেই বার্তা নেই বৃষ্টি নেমেছে, আঝোরধারায়। ঝলমলে রোদের সকালে বা দুপুরে পৌঁছেছি, ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বিকেল। ফেরার সময় হয়ে গেল। ভাবছি এবার বৃষ্টি আমাদের খবর পায় নি। ঠিক তখনই, সাবধান হওয়ার সামান্য সুযোগও না দিয়ে নামল বৃষ্টি, ঝমঝমিয়ে, একেবারে ব্লিৎসক্রিগ যেন। আশ্চর্য, একই কাণ্ড ঘটল পোল্যান্ডে, আউশউইৎজ-এ। ব্যাপারটা বলতেই ভালদেমার গম্ভীর হয়ে

গেল আর হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল তাদেউশ। দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তাদেউশের ঝোঁকটা ছিল সলিডারিটির দিকে আর ভালদেমার গোঁড়া কমিউনিস্ট।

আউশউইৎজ-এ প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি পড়েছিল। হাড় পর্যন্ত কেঁপে গিয়েছিল বৃষ্টিভেজা শীতে। সেই শীতে তাদেউশ বলেছিল তার স্ত্রী আনা-র মাসি আনিয়েলা বোলেসোয়াভার কাহিনী।

ক্র্যাকোফ-এর সওয়াশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পোল্যান্ডের পবিত্র শহর চ্যান্সটোহোভায় বাস করতেন আনিয়েলা। 'ব্ল্যাক ম্যাডোনা' সে শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তখন যুদ্ধ চলছে, শহর নাৎসিদের দখলে। দোকানে রুটি দিচ্ছে শুনে ছুটেছিলেন চার সন্তানের জননী আনিয়েলা। শহর প্রায় দু-সপ্তাহ রুটিহীন। তাঁকে একা ছাড়বেন না বলে সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর দিদি মারিয়া। রুটি পাওয়া গিয়েছিল। রুটি নিয়ে বাড়িতেও প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন দুজন। হঠাৎ চোখে পড়েছিল বড় রাস্তার মোড়ে মিলিটারি ট্রাক। রাস্তা থেকে লোক ধরে ধরে তুলছে। দুই বোন দৌড়তে আরম্ভ করেছিলেন। ফৌজের বেষ্টনী ভেদ করে চলে গিয়েছিলেন মারিয়া। আনিয়েলা পারেন নি। মারিয়া দেখেছিলেন বোনকে ওরা ছুঁড়ে দিচ্ছে ট্রাকের ভেতর। আনিয়েলা দেখেছিলেন দিদি দেখছে। তিনি আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, বাঁচাও, বাঁচাও! ট্রাক চলে গিয়েছিল আউশউইৎজ-এর দিকে।

আউশউইৎজ-এ এগার নম্বর ব্লকের নাম 'ব্লক অফ ডেথ'। তার ঠিক পাশের দেওয়ালটিই 'ওয়াল অফ ডেথ'। সেই প্রাচীরের পায়ের কাছে বছরে একবার বোলেসোয়েভা পরিবার ফুল রেখে আসেন। সারা বছর সেখানে ফুলের পাহাড় জমেই থাকে।

এমনি এক বৃষ্টির বিকেলে আটকে পড়েছিলাম বুখেনওয়াল্ড বন্দীশিবিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের বাইরে, 'স্ট্রিট অব্ ব্লাড'-এর পাশে দীর্ঘ, নিরাভরণ ক্যান্টিনে। জি ডি আর-এর সর্বত্রই বই আর ছবির আড্ডা। হয় একটা দোকান নয় লাইব্রেরি, অন্তত একটা প্রদর্শনী পাওয়া যাবেই একশ হাতের মধ্যে, যে কোনো স্থানে এবং অস্থানেও। সেই ন্যাড়া ক্যান্টিনের মুখেও ছিল একটা বইপত্রের দোকান। সেই দোকানের এক কোণে পড়ে ছিল 'কুন্‌স্ট্ হিন্টার স্টাখেলড্রাহট'-এর একটি কপি। রাহেল স্প্রিংগারই দেখিয়েছিল।

এখন, আটের দশকের শেষে জি ডি আর এবং পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে, নতুন নতুন কথা। নতুন কথার তোড়ে পুরনো সব কথাই ভেসে যাচ্ছে, মন্দ যেমন তেমনি ভাল কথাও, অ-যুক্তি, এবং যুক্তি দুই-ই।....'ভালও কিছু ছিল নাকি'?

বন্দীশিবির ইওরোপের দুই অংশেই দেখেছি, পুবে ও পশ্চিমে, প্রাচীরের এপারে এবং ওপারে। দুদিকেই খুব যত্নে, স্মৃতির শ্রদ্ধায় এবং আতঙ্কের স্মৃতিতে রক্ষা করা হয় বন্দীশিবিরের মিউজিয়াম। পশ্চিমে মিউজিয়াম খোলা থাকে, যার আসার এস। তেমন কি কেউ আসে? পুবে একেবারে শৈশব থেকেই মনের গভীরে চারিয়ে দেওয়া হয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভাবনা, পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে চেতনা। সমাজ সেখানে তীক্ষ্ণ সচেতন, নতুন প্রজন্ম যেন ভুলে না যায় কী ঘটেছিল এবং তারা যেন মনে রাখে। সেই ভয়ংকর ঘটনা আবারও ঘটতে পারে, ঘটতেও পারে, কিন্তু ঘটতে দেওয়া দেওয়া যাবে না কিছুতেই। বুখেনওয়াল্ড থেকে আউশউইৎজ সর্বত্র দেখেছি, এবং প্রতিবারই দেখেছি ছোট ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে ঢুকছে ভেতরে, তাদের হাতে ফুল, মুখ জুড়ে গভীর ছায়া।

এখন বার্লিনের প্রাচীরে অনেকগুলি দ্বার। অনেক সহজে জার্মানেরা এপার ওপার করতে পারেন। আমাদের এই বাংলাকেও দু-টুকরো করা হয়েছে। বাঙালি ভালই বোঝে জার্মানদের কষ্ট। ওদের কষ্ট আরো বেশি, ওদের শহরটাও ভাগ করা হয়েছে। এখন কথা চলছে ভাগাভাগির

প্রাচীরটাই ভেঙে ফেলার, দুই শহরকে এক করে দেওয়ার, দুই জার্মানিকে মিলিয়ে দেওয়ার। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন সম্ভাবনার উচ্ছ্বাসে কারো মনে নেই অল্প কিছুদিন আগে পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্ট বুন্ডেস্টাগ-এ পশ্চিম বার্লিন থেকে নির্বাচিত হয়েছে ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতিনিধি, যে পার্টির ঐকান্তিক আনুগত্য হিটলারের প্রতি, এবং সে আনুগত্য প্রকাশ্যেই ঘোষিত। সে পার্টি মুখে বলে বুখেনওয়াল্ড থেকে বির্কেনাউ সবই জার্মান বিরোধীদের রটনা আর মনে মনে ভাবে, হয়ত ভাবে, হিটলার, গোয়েরিং আর হিমলাররা বড় বেশি কোমল ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত হারতে হয়েছিল তাদের। পরের বার আরো 'শক্ত' হতে হবে, আরো 'খাঁটি আর্য' হতে হবে।

১৯৩৯ সালটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। বিশ্বকে চিরকালের জন্যে ইহুদিমুক্ত করার হিটলারি পরিকল্পনা 'ফাইন্যাল সলিউশনে'রও পঞ্চাশ বছর। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ড দখলে আসতেই [আউশউইৎজ, বির্কেনাউ, ডাখাউ, বুখেনওয়াল্ড, রাভেন্সব্রুক সর্বত্র] শুরু হয়েছিল 'ফাইন্যাল সলিউউশন'—পাইকারী হারে ইহুদিনিধন। অর্ধশতাব্দী পরেও বার্লিনে 'জনগণের ভোটে' ফ্যাসিস্ট পার্টির জয়লাভে কোনো ফরাসি, কোনো পোল, কোনো চেক বা রুশ বা ব্রিটিশ কিংবা মার্কিন অথবা উদারপন্থী কোনো জার্মান যদি ফিসফিস করে বলেন, দুই জার্মানি মিলে যায় যাক, শহরের মাঝখানে বিশ্রী প্রাচীরটা ধসে পড়তে চায় পড়ুক, শুধু আর কোনো বুখেনওয়াল্ড যেন না হয়, আর কোনো রাভেন্সব্রুক, আর কোনো ডাখাউ অথবা আউশউইৎজ...তবে কি তাঁকে রক্ষণশীল অথবা প্রাচীনপন্থী কিংবা গোঁড়া বলে গাল পাড়া যায়?

পুরনো স্মৃতি কিংবা ইতিহাস হিশাবে নয়, 'মৃত্যুশিবিরের শিল্প'-এর প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব ঠিক এইখানেই, আজও। কিংবা কে জানে, সে প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব আজ হয়ত আরো বেশি।

দেশে ফিরে তরুণ বন্ধু সৌমেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলে উলফগাং স্নাইডারের লেখা জার্মান থেকে বাংলা করে ফেলা গিয়েছিল। এ কাজে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন অগ্রজ সাহিত্যিক দেবেশ রায়। 'প্রতিক্ষণ'-এর পাতায় সে অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদক স্বপ্না দেবের আগ্রহাতিশয্যে। অবশেষে প্রতিক্ষণ প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার প্রিয়ব্রত দেবের ইচ্ছায় তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এই দুর্মূল্যের দিনে এ ধরনের প্রকাশনায় যে বিপুল ব্যয় অনিবার্য তার ধকল সহ্য করেও এবং এ গ্রন্থ যে আদৌ হৈহৈ করে বিক্রী হওয়ার নয় একথা সম্যক জেনেও এমন ইচ্ছাকে তিনি প্রশ্রয় দেওয়ায় তাঁর ঐহিক কাণ্ডজ্ঞানের প্রশংসা করা কঠিন হয়ে পড়ে যদিও তাঁর বোধ ও সাহসের সাধুবাদ করতেই হয়।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়



'সিংগিং হর্সেস'—শিল্পী হেনরি পাক

ভূমিকা

নোবল বি দ্য ম্যান
হেলপফুল অ্যান্ড গুড

মন্ত্রের মত এই শব্দগুলির উচ্চারণ করেছিলেন যিনি সেই মহান গ্যেটের নিজের শহর ভাইমার। এই শহরের আরেক কবি, গ্যেটের অন্তরঙ্গ বন্ধু, শিলারও লিখেছিলেন এমনি সব কথা, অল ম্যান শ্যাল বি ব্রাদার্স। তবু তাঁদের শহরের হাতের কাছে এটেসবার্গ পাহাড়ের গায়ে বুখেনওয়াল্ডে পৌঁছে মনে কেমন সংশয় জাগে। বুখেনওয়াল্ডের নির্মম সত্য কি এইসব কথার অসারতা প্রমাণ করে দেয় নি? মর্মান্তিক সেই অভিজ্ঞতার পরেও কি রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবা যায়, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ?

১৯৩৩ সালে ফ্যাসিবাদ জার্মানির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। অ্যাডলফ হিটলার তার চ্যান্সেলর। সন্ত্রাস, ব্ল্যাকমেইল এবং হত্যা দিয়েই হিটলারের যাত্রা শুরু। ক্ষমতা হাতে পেয়ে

পুর্ণোদ্যমে এবং সুপরিকল্পিতভাবে গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয় যাবতীয় বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার কাজ। কমিউনিস্ট নিধন দিয়ে যার শুরু অক্টোপাসের সেই অভিযান ইহুদি, খ্রিস্টান, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাট, এমনকী গির্জার পাদ্রীদেরও রেহাই দেয় না।

জেলখানা যথেষ্ট নয়। দেশ জুড়ে একটার পর একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়—ডাখাউ, সাখসেনহাউসেন, রাভেন্সব্রুক, বুখেনওয়াল্ড। প্রথম বন্দী শিবিরটি তৈরি হয়ে যায় ১৯৩৪ সালেই, এস এ-র উদ্যোগে। পরে দায়িত্ব নিয়ে নেয় কুখ্যাত এস এস বাহিনী।

গোড়ায় এইসব শিবিরের প্রধানত ইহুদি এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জার্মানদেরই ধরে রাখা হত। ১৯৩৮ সাল থেকেই শিবিরগুলি হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বন্দীশালা। পরবর্তীকালে নাৎসি বাহিনীর হাতে ইউরোপের একটির পর একটি দেশের পতন ঘটলে ডেনমার্ক থেকে পোল্যান্ড—বিভিন্ন দেশে এমনি বন্দীশিবির গড়ে তোলা হয়। এইসব শিবিরে জার্মানির ও অন্যান্য দেশের মোট এক কোটি আশি লক্ষ মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁদের মধ্যে এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ আর কোনোদিন স্বাধীনতার মুখ দেখতে পান নি। বন্দীশিবিরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—অনাহার, শীত, রোগ, মহামারী, হাড়ভাঙা পরিশ্রম, নাৎসি ডাক্তারদের পরীক্ষাগার, ছুরি, চাবুক, গুলি, ফাঁসি এবং গ্যাসচেম্বার তাঁদের ঘরে ফিরতে দেয় নি।

ভাইমারের উত্তর-পশ্চিমে এটেসবার্গ পাহাড়। গ্যেটের খুব প্রিয় বেড়াবার জায়গা। ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মে এস এস বাহিনী সেখানে একটি বন্দীশিবির গড়ে তোলে। কিছুদিন পরে এর নাম দেওয়া হয় বুখেনওয়াল্ড। বুখেন গাছ অর্থাৎ বীচ গাছের জঙ্গল।

খুব চওড়া, কালো পীচে ঢাকা রাস্তা এসে শেষ হয়েছে শিবিরের প্রধান প্রবেশদ্বারে। তখন রাস্তাটার নাম ছিল ক্যারাচো ওয়েগ, শিবিরের বন্দীরা বলতেন স্ট্রিট অব ব্লাড। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তৈরি করা হয় রাস্তাটি, বড় বড় ট্রাক ভরতি করে বন্দী আনা শুরু হয়ে গেছে তখন। হাজার হাজার বন্দী রাত্রিদিন পরিশ্রম করে, লাঠি আর চাবুকের আঘাত সহ্য করে তৈরি করেন রাস্তাটি। অনেকেরই মৃত্যু হয় অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার এবং মারের আঘাতে। প্রতিদিন সকালে এই পথে নিয়ে যাওয়া হত শত শত বন্দীকে, তাঁদের কাজের জায়গায় এবং সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনা হত। যাতায়াতে তাঁদের নিয়ত সঙ্গী লাঠি ও চাবুকের আঘাত, ব্লাড হাউন্ডের অত্যাচার, মাঝেমাঝেই বন্দুকের গুলি। মানুষের অনেক রক্ত ঝরেছে এই পথে। পথের শেষে প্রধান প্রবেশদ্বারের উপর খুব বড় হরফে গ্রীল করে লেখা : ইয়েডেম ডাস জাইনে—যার যা প্রাপ্য সে তাই পায়।

শিবিরে পৌঁছাবার পর বন্দীর নাম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেত। তাঁর হাতে উলকি দিয়ে একটা নম্বর আঁকা থাকত। সেটাই তাঁর পরিচয়। প্রবেশদ্বারের সঙ্গে লাগোয়া বাড়িটি ছিল শিবির কম্যান্ডার ও পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, গেস্টাপোর দপ্তর। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখানে ডাকা হত বন্দীদের। এই অফিসের ডাক এবং মৃত্যুদণ্ড শোনা ছিল সমার্থক। গেস্টাপোর জেরা করার নানা পদ্ধতির মধ্যে একটি ছিল দাঁড় করিয়ে রাখা। জানলা বা থামের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে বন্দীকে দাঁড় করিয়ে রাখা হত, শোওয়া-বসা ত দূরের কথা, পাশফেরাও ছিল অসম্ভব। বন্দীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত দিনের পর দিন, যতক্ষণ না শ্রান্তিতে তাঁর মৃত্যু হয়। গোটা শিবিরটা ঘেরা থাকত দেড় থেকে দু-মানুষ উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। সেই তারে সবসময় জোরাল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হত। গেট পেরিয়েই বিরাট খোলা জায়গা—রোলকলের মাঠ। তার পিছনে সার সার ব্যারাক। প্রত্যেক ভোরে এবং সন্ধ্যায় প্রবল শীতে এবং বর্ষণের মধ্যেও রোলকলের নাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা হত হাজার হাজার বন্দীকে—বৃদ্ধ, যুবক, এমনকী শিশুদেরও। প্রায়

প্রতিদিন অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে বন্দীদের দেখতে হত সহবন্দীদের চাবুক খাওয়ার দৃশ্য। বন্দীকে নগ্ন করে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ঘা চাবুক বা বেত মারা হত। একবার একটানা আঠার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয় তাঁদের। পরিশ্রমে, অনাহারে, রোগে অবসন্ন বহু বন্দী তাঁদের কমরেডদের চোখের সামনেই শেষ হয়ে যান দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে—এই মাঠে।

মাঠ পেরিয়েই সার সার ব্যারাক। কয়েকশ মানুষও আঁটে না এমন জায়গায় হাজার হাজার বন্দীকে থাকতে হত। যুদ্ধের শেষ দিকে একসময় চল্লিশ হাজার বন্দীও ছিলেন বুখেনওয়াল্ডে। একটি নমুনা : আটাশটি ঘোড়া রাখার একটি আস্তাবলে ব্যারাক বানানো হয়। জানলা নেই, কোনোরকম স্যানিটারি ব্যবস্থা নেই, তিন-চার তাকের বাংক, থাকতে হত দু-হাজার বন্দীকে। তিন-চার জনের জন্যে একটিমাত্র কম্বল। ভিজে নোংরা কাপড়ে তার তলায় শুয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করতেন বন্দীরা। ঘুমিয়ে পড়লে অনেকেই ভোরে উঠে দেখতেন একজন মৃত মানুষ তাঁকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছেন অথবা তিনিই জড়িয়ে আছেন সেই মৃতকে।

যুদ্ধচলাকালীন বুখেনওয়াল্ডে বত্রিশটি জাতির মানুষ বন্দী ছিলেন। এস এস বাহিনী বিশেষভাবে নির্মম আচরণ করত ইহুদিদের প্রতি এবং পোল্যান্ড ও সোভিয়েত মানুষের প্রতি।

১৯৩৮ সালে জার্মানিতে 'ক্রিস্টাল নাইট'-এর পালা শুরু হয়ে গেলে হাজার হাজার ইহুদিকে ধরে আনা হয় বুখেনওয়াল্ডে। অখাদ্য খাবার, এমনকী জলটুকুও তাঁদের অবিশ্বাস্য দামে কিনে নিতে হত। যাঁদের কেনার ক্ষমতা ছিল না তাঁদের জন্যে বরাদ্দ থাকত লাঠি ও চাবুক। খাদ্য বা জলের আর প্রয়োজন হত না তাঁদের।

জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার পর রোলকলের মাঠে বড় বড় চারটি তাঁবু খাটানো হয়। হাজার হাজার পোলিশকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। অনাহার, মহামারী এবং সরাসরি হত্যা তাঁদের সব কষ্টের অন্ত ঘটায়। কয়েকমাসের মধ্যেই ১৬০০ পোলিশ বন্দী নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

শিবিরের পশ্চিমপ্রান্তে একটি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। সেটিকে ব্যারাকে পরিণত করা হয়। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে এখানে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের আটক করে রাখা হয়। যাবতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইন লঙ্ঘন করে ৮৪৮৩ জন সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই ব্যারাকে হত্যা করা হয়। যে আদেশ অনুযায়ী এই গণহত্যা সংঘটিত হয় সেই 'কমিসার অর্ডারটি' জারি করা হয় ১৯৪১ সালের ৬ জুন, হিটলারের ফৌজ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার আগেই।

কয়েকহাজার শিশু বন্দী ছিল বুখেনওয়াল্ডে। ইহুদি, জার্মান পার্টিজান, পোলিশ ও সোভিয়েত বন্দীদের সন্তান। প্রায় সকলেরই বাবা-মা মৃত বা নিহত। এই শিশুদের চোখের সামনেই ঘটে যেত শিবিরের বীভৎস ঘটনাবলী। হাজার হাজার শিশুদের মধ্যে শেষপর্যন্ত বেঁচে ছিল ৯০৪ জন।

শিবিরের প্রধান খাদ্য ছিল রুটি। যুদ্ধ শুরু হতেই রুটির রেশন কমতে কমতে ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রতিদিন মাথাপিছু ৩৫০ গ্রাম, ১৯৪৪-৪৫ সালে ২৫০ গ্রাম হয়ে যায়। সোভিয়েত বন্দীদের জন্যে বরাদ্দ ছিল দৈনিক ১০০ গ্রাম করে।

এটুকু রুটিও এমনি এমনি দেওয়া হত না। প্রত্যেকটি বন্দীকে প্রতিদিন বার থেকে আঠার ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া হত। শিবিরের ভেতরে নানা ধরনের কাজ, বাইরে এস এস বাহিনীর অফিসারদের ক্লাবে, বাড়িতে ও বাগানে, বুখেনওয়াল্ডের অস্ত্রনির্মাণ কারখানায়, পাথরের খাদে, মাটির তলায় ভি-রকেট নির্মাণের কারখানায় খাটতে হত তাঁদের। এই সঙ্গে

ছিল দিবারাত্র ক্রিমেটোরিয়াম চালানো এবং সহবন্দীদের জন্যে গণকবর খোঁড়া।

বিপুল সংখ্যক বন্দীকে পাঠানো হত বড় বড় এবং বিখ্যাত সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কলকারখানায় খাটতে। এইসব কোম্পানি হিটলারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগাত। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফ্লিক, ক্রুপ, থাইসেন, আই জি ফার্বেন ইন্ডাস্ট্রি, সিমেন্স এবং এ ই জি ট্রাস্ট। ক্ষমতায় আসার পর হিটলারও এদের বিপুল মুনাফার পথ করে দেয়। এরা নাৎসি সরকারের কাছ থেকে ব্যাপক অস্ত্রসম্ভার যোগানোর বরাত পায়। সবরকমভাবে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার এবং শেষপর্যন্ত তাদের প্রতিষ্ঠানে দাসশ্রম যোগান দেওয়ার দায়িত্ব নেয় নাৎসি সরকার। বুখেনওয়াল্ড ও অন্যান্য বন্দীশিবির থেকে অসংখ্য মানুষকে পাঠানো হয় এদের প্রতিষ্ঠানে প্রায় বেগার খাটতে। নুরেনবার্গ আদালত বিচারের সময় এস এস বাহিনীর এক কর্তা এস এস অর্থনৈতিক বিভাগের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধান ওবার গ্রপেনফুয়েরার পোহল তার বিবৃতিতে বলে, "শ্রমশক্তির তীব্র অভাবের ফলে বন্দীশিবির থেকে শ্রমিক পাওয়ার জন্যে অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই আমার দপ্তরকে ধরত এবং যারা আগে থেকেই বন্দীশিবিরের শ্রমিক পাচ্ছিল তারা চাপ দিত বন্দী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে।"

স্বভাবতই এইসব প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়ছিল রকেটের গতিতে। একটি দৃষ্টান্ত : শিবিরের হাজার হাজার বন্দীকে আই জি ফার্বেন তাদের উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করত। তাদের মুনাফা বাড়ে এইভাবে :

১৯৩২—৪ কোটি ৮০ লক্ষ মার্ক
১৯৩৭—২৩ কোটি ১০ লক্ষ মার্ক
১৯৪৩—৮২ কোটি ২০ লক্ষ মার্ক

নুরেনবার্গ আদালতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে এই কোম্পানিগুলির বহু বড় কর্তার শাস্তি হয়। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই তারা মুক্ত হয় এবং পশ্চিম জার্মানিকে কেন্দ্র করে বিশ্বময় তাদের বাণিজ্য জাল ছড়িয়ে দিতে থাকে।

বুখেনওয়াল্ডের বন্দীদের কাছে সবচেয়ে ত্রাসের ব্যাপার ছিল পাথর-খাদে কাজ করা। প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বন্দী মারা যেতেন এই খাদে। গ্রীষ্মে-বর্ষায়-শীতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বন্দীদের পাথর ভাঙতে হত, হাত দিয়ে গাড়িতে ভরতে হত, গাড়িটা টানতে টানতে নিয়ে যেতে হত। গরু আর ঘোড়ার মত গাড়ির সঙ্গে বাঁধা দড়ি কেটে বসে যেত ঘাড়ে। পাথর বোঝাই গাড়িটা টানার সময় গান গাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। গান থামলেই লাঠি ও চাবুক। এই সঙ্গে ছিল প্রতিক্ষণের সঙ্গী ক্ষুধা। প্রধানত ইহুদি বন্দীদের দিয়েই এইভাবে টানানো হত পাথর ভাঙা গাড়ি। যে গ্রুপ এই কাজটা করত তাদের বলা হত 'সিংগিং হর্সেস'। বস্তুত পাথর-খাদে বন্দীদের হত্যা করার জন্যেই পাঠানো হত—হয় তাঁদের পেটাতে পেটাতে খুন করা হত অথবা দুই সার গার্ডের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে বন্দুকের গুলি অপেক্ষা করত তাঁদের জন্যে। 'পলায়নের চেষ্টা করার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত'।

মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বেশ কিছু অস্ত্রনির্মাণ প্রকল্প মাটির নীচে গড়ে তোলা হয়। প্রকৃতির তৈরি করা বড় বড় গুহায়, যেমন নর্ডহাউসেনের কাছে—কোয়েনস্টাইন পর্বতে এস এস বাহিনী কুখ্যাত 'ডোরা' বন্দীশিবিরটি গড়ে তোলে। এখানে তৈরি হত জার্মানির রহস্যময় অস্ত্র 'ভি-ওয়েপন'। বন্দীদের সেখানে খাটতে হত ক্রীতদাসের মত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁরা দিনের আলো দেখতে পেতেন না। তাঁরা

ছিলেন 'কনডেমড', ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, যেহেতু অনেক 'গোপন তথ্য' তাঁরা জেনে ফেলেছেন।

এসবের পরেও যাঁরা বেঁচে থাকতেন তাঁদের জন্যে ছিল নানা ব্যবস্থা। নাৎসি ডাক্তারেরা নানা রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে বন্দীদের গিনিপিগ হিশাবে ব্যবহার করত। বেছে বেছে ভাল স্বাস্থ্যের মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া হত পরীক্ষাগারে, ফিরে আসত তাঁর মৃতদেহ, আই জি ফার্বেন কোম্পানির হয়ে এস এস বাহিনীর বেশ কয়েকজন ডাক্তার নিয়মিত এই ধরনের পরীক্ষা চালাতেন। যাঁদের গায়ের চামড়া বিশেষ ভাল অথবা গায়ে উলকি আঁকা আছে তাঁদের প্রতি বিশেষ নজর ছিল এস এস বাহিনীর। তাঁদের চামড়া দিয়ে যেমন নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হত তেমনি তৈরি হত নানা শৌখিন সামগ্রী। যেমন আলোর শেড, খাতার মলাটের ঢেকা ইত্যাদি। সামান্য নিয়মভঙ্গের অপরাধে সরাসরি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, গাছের ডালে অথবা বিশেষভাবে তৈরি করা কাঠের বীমে। লঘুতর অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হত না। দুটো হাত পিছমোড়া করে বেঁধে হাত দুটোয় দড়ি বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, দেহটি ঝুলতেই থাকত মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।

আর ছিল সরাসরি হত্যা। দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে দেওয়া। বুখেনওয়াল্ড শিবির মুক্ত হওয়ার মাত্র কয়েকমাস আগে ১৯৪৪ সালের ১৮ অগাস্ট এমনি করেই খুন করা হয় জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর এক শ্রেষ্ঠ সন্তান, কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এরনস্ট থেলম্যানকে। কয়েকদিন পরে এখানে মরতে হয় রাইখস্ট্যাগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গ্রুপের চেয়ারম্যান রুডলফ ব্রাইট শাইডকে। ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিও ব্লুম, দালাদিয়ের প্রমুখ কয়েক জন কোনোক্রমে বেঁচে গেলেও অনেককেই মরতে হয় বুখেনওয়াল্ডে।

ঝড়ের পর যেমন ঝরাপাতা ছড়িয়ে থাকে মাটিতে, বুখেনওয়াল্ড শিবিরের সর্বত্র প্রতিদিন সকালে ছড়িয়ে থাকত বন্দীদের মৃতদেহ। বন্দীদের মৃতদেহগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হত শিবিরের ক্রিমেটোরিয়ামে—যার চিমনি থেকে দিনরাতই ধোঁয়া বেরত, বিরতিহীন। শেষ দিকে ক্রিমেটোরিয়ামের ক্ষমতায় কুলাত না বলে বন্দীদের দিয়ে খোঁড়ানো হয় গণকবর।

১৯৩৭ সালের ১৬ জুলাই থেকে ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বত্রিশটি জাতির ২,৩৮,৯৮০ জন মানুষকে বন্দী করে আনা হয় বুখেনওয়াল্ডে। এঁদের মধ্যে ১,৬০,০০০ মানুষকে পাঠানো হয় অন্যান্য শিবিরে বা কলকারখানায় কাজ করতে, সাত বছর সাড়ে আট মাসে মৃত ও নিহতের সংখ্যা ৫৬,০০০। ১৯৪৫ সালের ১১ এপ্রিল বুখেনওয়াল্ড মুক্তির সময় বেঁচে ছিলেন ২১,০০০ বন্দী।

প্রত্যেকটি বন্দীশিবির যেন ধর্ষিত ও রক্তাক্ত ইউরোপের দর্পণ। বুখেনওয়াল্ডও তাই।

তবু বৃথা নন গ্যেটে, শিলার অথবা রবীন্দ্রনাথ। এইসব নির্মম অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও। বুখেনওয়াল্ড সত্ত্বেও। বুখেনওয়াল্ডই তা প্রমাণ করেছে।

বুখেনওয়াল্ড শিবিরের প্রধান কোখ-এর বাড়ি তৈরির কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল কিছু বন্দীকে। দুজন বন্দী একটি শিশির ভেতরে এক টুকরো কাগজ ভরে শিশিটি রেখে দেন বাড়ির ভিত-এর তলায়। কাগজটিতে লেখা ছিল : কমপেলড বাট নট কনকারড। যেন সমগ্র বুখেনওয়াল্ডের হয়ে বলছেন তাঁরা।

হিটলারের নাৎসি বাহিনী যা যা করা সম্ভব সবরকম অত্যাচার করেছে, তবু বন্দীদের মনুষ্যত্ব আর মর্যাদাবোধ ধ্বংস করতে পারে নি। শেষ লড়াইয়ে, সেই জন্যেই ফ্যাসিবাদী বর্বরতাকে হার মানতেই হয়, জিতে যায় মানুষই।

বুখেনওয়াল্ডে নামমাত্র যে চিকিৎসাব ব্যবস্থা ছিল তাতে কোনো অধিকার ছিল না ইহুদিদের। পোলিশ এবং সোভিয়েত বন্দীরাও কোনো চিকিৎসার সুযোগ পেত না। অন্য বন্দীরা নিজেদের ব্যারাকে গোপনে তাঁদের চিকিৎসার আয়োজন করেন। অনেকের ক্ষত নিরাময়ের জন্যে অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে অপারেশনও করেন। প্রয়োজনীয় ছবি ইত্যাদি গোপনে তৈরি করতে হয়, ওষুধপত্র চুরি করে আনতে হয় এস এস বাহিনীব ভাঁড়ার থেকে। বলা বাহুল্য, নিজেদের জীবন বাজি রেখেই এসব করেছেন তাঁরা অন্য জাতির, অন্য ভাষার ও ধর্মের মানুষের জন্যে। কিন্তু করেছেন।

শিবিরের রান্নাঘরে যাঁরা কাজ কবতেন, তাঁরাও পবম মনুষ্যত্ব ও বীরত্বেব পরিচয় দিয়েছেন। খাবার চুরি করে পাচার করেছেন সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের জন্যে, কর্তৃপক্ষ যাঁদের খাওয়া বন্ধের শাস্তি দিয়েছেন তাঁদের জন্যে।

শুধু গোপনে চুরি করে নয়, নাৎসিদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতেও নেমেছেন বন্দীরা। পিতৃহীন, মাতৃহীন, শিশুদের বাঁচাবার জন্যে রুখে দাঁডিয়েছেন, তাঁদেব জন্যে একটা নিজস্ব ব্লক—৮ নং ব্লক আদায়ও করেছেন। কঠোব শ্রম ও নিশ্চিত মৃত্যুব হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্যে হিমালযের দৃঢতা দেখিয়েছেন তাঁরা এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। সোভিয়েত ও জার্মান বন্দীরা এইসব শিশুদের নিয়মিত লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কাজটা নাৎসি নিয়মের বিরোধী, তাই একদল বন্দী যখন তাদের পডিয়েছেন আব একদল পাহারা দিয়েছেন। শিশুবন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল পোল্যান্ডের স্টেফান ইয়ারসি সোয়াইগ, চার বছর বয়স, ডাক নাম ইয়শু। তাকে বাঁচানোর জন্যে দৈত্যের শক্তি নিয়ে লড়াই করেন বন্দীরা। এই লড়াই-এর কাহিনীই বলেছেন বুখেনওয়াল্ডের প্রাক্তন বন্দী ব্রুনো আপিৎজ তাঁর অসাধারণ উপন্যাস 'নেকেড অ্যামং উলভ্স'-এ।

যে বন্দীরা ডাক্তার ও নার্সের কাজ করতেন, অসংখ্য সহবন্দীকে তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে এমন বন্দীকে তাঁরা মৃত কোনো বন্দীর নম্বর দিয়ে শুইয়ে রেখেছেন হাসপাতালে। আপাতত রক্ষা পেয়েছে তাঁর প্রাণ। ধরা পড়লেই এর জন্যে অবধারিত মৃত্যু। এবং কখনো কখনো কেউ যে ধরা পড়েন নি তাও নয়। ধরা পড়ে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু গেস্টাপো তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারে নি। এক-আধবার নয়, বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

বুখেনওয়াল্ডের বন্দীরা শুধু নিজেদের কথা ভাবেন নি, সহবন্দীদের সাহায্য করার মধ্যেই তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। শিবিরের বাইরে, সমগ্র পৃথিবীতে যে যুদ্ধ চলেছে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার যুদ্ধ, তার কথাও ভেবেছেন এবং অসীম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা অনুযায়ী কাজও করেছেন।

কিছু বন্দী কাজ করতেন অফিসে এবং শ্রম-তথ্য দপ্তরে। বিভিন্ন অস্ত্রকারখানায় তখন বন্দীদের পাঠানো হচ্ছে কাজ করতে। অফিসে কর্মরত বন্দীরা মাঝে মাঝেই বন্দীদের পেশাগত যোগ্যতার বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য গোলমাল করে দিতেন, কখনো বানিয়ে লিখে দিতেন, কখনো-বা গোপন করতেন। উদ্দেশ্য, অস্ত্র কারখানাগুলি যেন দক্ষ শ্রমিক না পায়, অদক্ষ শ্রমিকই যেন কাজে যায়। এইভাবে তাঁরা একদিকে কঠোর শ্রম করা থেকে রক্ষা করতেন দুর্বল ও রুগ্ন সহবন্দীদের, অন্যদিকে অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতেন।

যে বন্দীদের অস্ত্র কারখানায় কাজে যেতে হত তাঁরাও নানাভাবে স্যাবোতাজ করতেন। মূল্যবান কাঁচামালের অপচয় ও অপব্যবহার, ভুলভাবে গুদামজাত করা, ড্রয়িং বদলে



দেওয়া, মাপ ও ওজনের ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই কাজ করতেন।

বাছাই করা বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হত পাহাড়ের গুহায় গড়ে তোলা 'ডোরা'য় কাজ করতে। সেখানে গোপনে তৈরি করা হচ্ছিল জার্মানির 'ভি-রকেট'। ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে ব্রিটেনের উপর আঘাত হেনে তাকে নতজানু করার উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রের উপর অগাধ আস্থা ছিল হিটলারের। 'ডোরা' থেকে কোনো বন্দীকে বেরতে দেওয়া হত না। সেখানেও তাঁরা স্যাবোতাজ-এর কাজ চালিয়ে গেছেন। বহু রকেট বেরিয়ে গেছে বিস্ফোরক ছাড়াই। অনেক রকেট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার আগেই ভেঙে পড়েছে। সন্দেহ করে এস এস বাহিনী তাঁদের উপর চরম অত্যাচার করেছে, অনেককে হত্যাও করেছে। এইভাবেই খুন হয়ে যান জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যালবার্ট কুনৎস। তবু বন্দীরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করে গেছেন। নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে ব্রিটেনের কত মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন তাঁরা। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বুখেনওয়াল্ডে মানবতা এক মহত্তর রূপ পাচ্ছিল। গ্যেটের বাসনাই যেন ক্রমাগত সত্য হয়ে উঠছিল। মানুষ প্রতিদিন মহান, সৎ ও সহায়ক হয়ে উঠছিল। ভাষা-ধর্ম-জাতির গণ্ডি পার হয়ে বুখেনওয়াল্ডের সেই নরকে মানবতা দ্রুত এবং শক্ত পায়ে বিশ্বজনীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভালবাসা, সহমর্মিতা এবং অভিজ্ঞতা তার বড় ভিত্তি, কিন্তু তাই সব নয়।

বুখেনওয়াল্ডে বন্দী বিশিষ্ট শিল্পী হ্যারবার্ট স্যান্ডবার্গ পরে লিখেছেন, "... তবে আমরা জানতাম আমাদের জীবনে একটা আদর্শ আছে। আমরা জানতাম কেন আমরা বন্দী হয়েছি। আর ওই আদর্শটাকে বন্দী জীবনের মধ্যেও আঁকড়ে ধরে প্রতিদিন চেষ্টা করতাম তাকে নতুন করে পেতে।"

আদর্শ, অভিজ্ঞতা আর প্রতিজ্ঞা বুখেনওয়াল্ডের মানবতাকে শুধু বিশ্বজনীনতাই দেয় নি, তাকে কর্মমুখর, ত্যাগী ও সংগ্রামী করে তুলেছে। এই বোধ ধীরে ধীরে সাংগঠনিক চেহারা নিয়েছে। জার্মান কমিউনিস্টদের সহায়তায় প্রথমে বিভিন্ন জাতির বন্দীরা নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলেছেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৩ সালে জাতীয় কমিটিগুলিকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে আন্তর্জাতিক কমিটি। বলাবাহুল্য সবই হয়েছে চরম গোপনীয়তার মধ্যে। বহু মানুষের প্রাণ গেছে। তবু গোপন গোপনই থেকেছে।

এই আন্তর্জাতিক কমিটির নেতৃত্বে ও গোপন পরিচালনায় একদিকে যেমন বন্দীদের রক্ষা করার কাজ চলত, ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ প্রয়াসে যথাসম্ভব বাধা দেওয়া হত, তেমনি ক্রমাগত প্রস্তুতি নেওয়া হত স্বাধীনতা অর্জনের, ফ্যাসিবাদী বাহিনীর হাত থেকে শিবিরকে মুক্ত করার। যত অসম্ভব ও অবিশ্বাস্যই মনে হোক না কেন, আন্তর্জাতিক কমিটি খুব ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে কিন্তু দৃঢ়ভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে। তাঁরা যেন নিশ্চিতভাবেই জানতেন, তাঁদের সময় আসবে।

জাতীয় প্রতিরোধ কমিটির সহায়তায় সামরিক ক্যাডার বাছাই করা হয়, অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়। অভ্যুত্থানের একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বন্দীরা অস্ত্রশস্ত্রের টুকরো টুকরো অংশ, এমনকী গুস্টলফ ওয়ার্কস থেকে আস্ত রাইফেলও নিয়ে চলে আসেন শিবিরে। নিজেদের তৈরি হাত বোমা, ছুরি-ছোরা ও তরোয়াল এবং মলোটভ ককটেল তৈরি করে বয়লার রুমে এবং শিবিরের অন্যান্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়। টেলিফোন কেবল, সার্চলাইট ইত্যাদি অচল করার ও বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হয়। প্রধান গেট ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে কাঠের বিমও এসে যায়। দুঃসাহসী কয়েকজন বন্দী এস এস বাহিনীর মালগাড়ি থেকে একটি হালকা

মেশিনগান ও দু-হাজার রাউন্ড গুলি চুরি করে শববাহী একটি গাড়ির ভেতর লুকিয়ে শিবিরে নিয়ে আসেন।

বাইরে তখন পূব দিক থেকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে সোভিয়েতের লাল ফৌজ। তার চাপে নাৎসি বাহিনী ব্যতিব্যস্ত। সেই সুযোগে পশ্চিম থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে মার্কিন সেনাবাহিনী। মার্কিন ফৌজ কাছাকাছি এসে পড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক কমিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দেয়। সেদিন ১৯৪৫ সালের ১১ এপ্রিল। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্যান্য সহবন্দীদের সঙ্গে নিয়ে ৮৫০ জন সশস্ত্র বন্দী সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মত অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শিবিরের কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। সমগ্র ইউরোপে ছড়ানো কয়েক ডজন বন্দীশিবিরের মধ্যে একমাত্র বুখেনওয়াল্ডই মুক্ত হয় বন্দীদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। মিত্রপক্ষের ফৌজ সেখানে এসে দেখে শিবির মুক্ত, তার মাথার উপরে উড়ছে মুক্তির পতাকা। ২১,০০০ বন্দী আর বন্দী নন, মুক্ত মানুষ। তাঁরা প্রমাণ করেছেন ফ্যাসিবাদী বর্বরতা শেষ কথা বলে না, বলে মানুষ, মানুষের মর্যাদা আর মহত্ত্ব।

গ্যেটের ফাউস্ট জীবনের সীমানায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও গাঢ় অন্ধকারের গভীরে ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট এক আলোর শিখা দেখতে পেয়েছিলেন।

বুখেনওয়াল্ডের বন্দীরাও হয়ত জানতেন সেই আলোর খবর। তাঁরা তাই নৃশংসতা ও বর্বরতার বন্দী হয়েও শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে যেতেও, আশা বিশ্বাস এবং আদর্শ ত্যাগ করেন নি ফাউস্টের মত। মানুষের মর্যাদায় তাঁদের বিশ্বাস এবং জীবনের প্রতি আস্থা এমনই দৃঢ় যে তাঁরা শুধু সহবন্দীদের প্রতি সহমর্মী হয়ে, তাঁদের সাহায্য করে অথবা ফ্যাসিস্ট যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে এবং নিজেদের মুক্তির প্রস্তুতি করেই ক্ষান্ত হন নি। যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, বুখেনওয়াল্ডের নরকেও তাঁরা সংস্কৃতির সাধনা করেছেন, ছবি এঁকেছেন, খোদাই করেছেন, মূর্তি গড়েছেন, কার্টুন এঁকেছেন, নাটক লিখেছেন, কবিতা ও গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, এমনকী বাজনা বাজিয়েছেন এবং গান গেয়েছেন। ক্ষুধার্ত, সন্ত্রস্ত, নিপীড়িত এবং মৃত্যুর বৃত্ত দিয়ে ঘেরা মানুষগুলি হয়ত শিল্প দিয়েই আলোর সেই শিখাটিকে দেখতে চেয়েছেন, কিংবা, কে জানে, শিল্পের এই চর্চাই হয়ত আলোর সেই শিখা।

বুখেনওয়াল্ডের সেই সময়ে কবিতা লেখা বা গান গাওয়া অথবা ছবি আঁকাও ছিল এক সংগ্রাম, কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রামেও নেতৃত্ব দিয়েছে বন্দীদের গোপন সংগঠন, শিল্পীদের রক্ষা করতে ও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন অশিল্পী বন্দীরা। ফলে শিল্পের কাজটা হয়ত করেছেন একজন বা কয়েকজন ; কিন্তু কাজটা হয়ে উঠেছে সকলের। দায় এবং ঝুঁকি নিয়েছেন সবাই সমবেতভাবে।... শিল্পী একটুকরো কাঠে খোদাইয়ের কাজ করে ফুটিয়ে তুলছেন একটা মুখ। তিনজন পাহারা দিচ্ছেন তাঁর হয়ে। কাঠের টুকরো থেকে গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ামাত্র কুড়িয়ে তুলছেন একজন। সংকেত পাওয়া মাত্র আরেক জন ছুটে এসে লুকিয়ে ফেলছেন অসমাপ্ত শিল্পকাজটি, অন্য একজন লুকোচ্ছেন খোদাইয়ের যন্ত্রপাতি। কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আরেক দল নিজেদের দায়িত্ব ভাগ করে নানা কৌশলে এবং অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে চালান করে দিচ্ছেন শিবিরের বাইরে। এইভাবে একটা সংহতি গড়ে উঠেছে শিল্পকে কেন্দ্র করে। নানা জাতির, ধর্মের, ভাষার বন্দীদের মধ্যে, ফ্যাসিবাদী বর্বরতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই সংহতিই ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার প্রধান মন্ত্র। বুখেনওয়াল্ডে বন্দী শিল্পী হ্যারবার্ট স্যান্ডবার্গ তাই অনায়াসে ঘোষণা করতে পারেন : "আমাদের সংহতি থেকেই গড়ে উঠেছে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব।"

বুখেনওয়াল্ডের মৃত্যুশিবিরে তৈরি শিল্পের মান কোন স্তরের ? একথার উত্তরের আগে

কয়েকটি কথা বুঝে নিতে হবে। দু-ধরনের শিল্প কাজ সেখানে হত। একটা বৈধ, এস এস বাহিনীর নির্দেশে ও স্বার্থে এইসব কাজ করতে হত শিল্পীদের। আর একটা অবৈধ, যা গোপনে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও করতেন শিল্পীরা। বুখেনওয়াল্ডে বন্দী ফরাসি শিল্পী আগস্ট ফেবিয়ার পরে লিখেছেন : "অনেক সময় একটুকরো রুটি বা সিগারেটের বদলে পাওয়া যেত একটা কাগজ আর পেন্সিল। এ দুটি হাতে থাকলেই যখনই সম্ভব হত আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তাম ছবি আঁকার কাজে। ধরে রাখতাম বন্দী জীবনের নানান মুখ আর দৃশ্য। অবশ্য আমাদের এই সৃষ্টিবাসনা এবং জীবনতৃষ্ণাকে চুরমার করে দিতে লেশমাত্র দ্বিধা করত না।" তবু 'বে-আইনী শিল্পই ছিল আসল কাজ'।

বুখেনওয়াল্ডের শিল্পকে মোটের ওপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, জীবনের প্রতি ভালবাসা এবং বেঁচে থাকার বাসনাকে শক্তিশালী করে—এমন সৌন্দর্যের সন্ধান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পসম্ভারকে রক্ষা করা, তার চর্চা করা এবং নিজেরাও সৃষ্টি করা। দুই, ফ্যাসিবাদী নৃশংসতাকে মূর্ত করে তোলা—প্রতিবাদী শিল্পের চর্চা। তিন, ফ্যাসিবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যময় শিল্প। একটু ভাবলেই ধরা পড়ে, সমস্ত শিল্পচর্চারই এক প্রাথমিক উদ্দেশ্য বন্দীদের মধ্যে হতাশা এবং হতাশাজনিত আত্মসমর্পণের মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জীবন ও মানবতার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থা বাঁচিয়ে রাখা ও দৃঢ় করার সংগ্রাম। সেই নরকে এক অসাধারণ কঠিন সংগ্রাম।

বুখেনওয়াল্ডের আর এক প্রাক্তনবন্দী হ্যারবার্ট তাঁর 'পার্টিজান উইদাউট আর্মস' বইয়ে এই সংগ্রাম ও সংগ্রামী শিল্পীদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : "... বরিস ছবি আঁকতে খুব ভালবাসে। বন্দীশিবিরের এই সান্ত্বনাহীন পরিবেশের মধ্যেও একজন মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে শিল্পের মধ্যে দিয়ে। হয়ত তার ছবিগুলি বিরাট কোনো শিল্পকর্ম নয়, কিন্তু সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা মানুষ মানুষের মত কিছু করছে, অন্য মানুষের জন্যে অনুভব করছে, ততক্ষণ সে মানুষই থাকে, 'মুজেলম্যান' হয়ে পড়ে না।"

অত্যাচারীর নিষ্ঠুরতার কাছে আত্মসমর্পণ করে যে মানুষ উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে বলে 'মুজেলম্যান।'

বুখেনওয়াল্ডের শিল্প তাই মানুষকে মানুষ থাকার এবং পাশবিকতা ও বর্বরতার সামনে দাঁড়িয়ে মহত্তর মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রামে সাহায্য করার শিল্প।

এই শিল্প এবং সংগ্রামের কথাই বলা হয়েছে উলফগাং স্নাইডারের জার্মান ভাষায় লেখা 'কুনস্ট হিনটার স্টাখেলড্রাহ্ট্' গ্রন্থে।

গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা তবু না বলে পারা যায় না। তা হল এর শান্ত ও ঠাণ্ডা স্বর। যে বীভৎস পরিবেশ এই বইয়ের পটভূমি তা ত প্রায় বাধ্যতই আবেগের দাবি করে। কিন্তু লেখক যেন 'জার্মান কুলনেস' পরিত্যাগ না করতে বদ্ধপরিকর। পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করবেন, বইটির অল্প অংশই স্নাইডারের নিজের লেখা। তিনি বুখেনওয়াল্ডের প্রাক্তন বন্দীদের কথা ও লেখা ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করেছেন এবং তাঁদের শিল্পকর্মের কাজের ছবি, কবিতা ইত্যাদি দিয়ে বইটি সাজিয়েছেন।

পরবর্তীকালের কোনো গবেষক দূর থেকে দেখে এবং ঘিলু দিয়ে বুঝে লিখতে গিয়ে শান্তস্বর বজায় রাখতে পারেন, হয়ত-বা। কিন্তু যাঁরা সেই নৃশংস অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন এবং বেঁচে আছেন, না-ও থাকতে পারতেন, তাঁরা যখন তাঁদের কথা বলেন, তাঁদের ও সহবন্দীদের জীবন, অভিজ্ঞতা, মৃত্যু ও শিল্পের কথা, তখন তাঁরা, শিল্পীরা, কীভাবে এমন করে ক্রোধ ও ঘৃণার গলায় লাগাম পরিয়ে দিতে পারেন, ভাবতে অবাক লাগে এবং শ্রদ্ধাও

বোধ হয।

ব্যাপাবটা এমনই, কোনো কোনো শিল্পী শিল্প ও তার নিজস্ব সমস্যাব কথা এমন মগ্ন ও নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, প্রায় বোঝাই যায় না, মৃত্যু ও ধ্বংস তখন ফ্যাসিবাদের চেহাবায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁদেব ঘাড়ের পিছনে।

ফ্যাসিবাদী বর্বরতাব কথা যে একেবারে আসে না, তা নয। কিন্তু নিছকই প্রসঙ্গক্রমে যেন, কখনো-বা উঁকি মেবে। যেন সেই ত্রাস, ধ্বংস আব মৃত্যুর বর্ববতা বড কথা নয, তার চেয়ে অনেক বড় হল জীবন—যে জীবন ওই মিশকালো অন্ধকাবেও আলো খুঁজেছিল। আসলে ত তাই। আব হযত সেইজন্যেই বুখেনওযাল্ডের একদা বন্দী উলফগাং লাং-হোফ বুখেনওয়াল্ডেব শিল্পীদের আঁকা ছবি সম্পর্কে লিখেছেন · ছবিগুলি 'গতকালেব, আজকেব, আর ভবিষ্যতেব বিজযী মানুষের সংগীত।'

বুখেনওয়াল্ডের শেষ লডাইয়ে বর্বর ফ্যাসিবাদকে দলিত করে মানুষই ত বিজযী হয়েছে। আর বিজয়ী মানুষ ত শান্ত স্বরেই কথা বলে।



কারু ও চারু শিল্প

কাটাতারেব পেছনে শিল্পচর্চা ছিল ফ্যাসিবিবোধী সংগ্রামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবং এইক্ষেত্রে কারু ও চারু শিল্পেব নানা শাখাব ভূমিকা ছিল অপরিসীম অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পীদেব হাতেব কাজই তার প্রমাণ। বুখেনওযাল্ড বন্দীশিবিরের সৃষ্টি, ভাস্কর্য, হস্তশিল্প, ছবি ও গ্রাফিকের কাজের মধ্যে দিয়ে শিল্পীদের ভাবনাব সামগ্রিকতাই ফুটে উঠেছে। ফর্ম ও বিষয—দু-দিক থেকেই বুখেনওযাল্ড শিল্পের বিস্তৃতি জ্যা টানা ধনুকের মতই ব্যাপক। ভাস্কর্য এবং ধাতুর ওপব শিল্পকাজ থেকে কাঠখোদাই কিংবা স্কেচ পর্যন্ত শিল্পেব নানা শাখায়

তা প্রসারিত। শিল্পীরা তাঁদের কাজের মধ্যেই একই সঙ্গে ধরে রেখেছেন সৌন্দর্যের শ্রী, ত্রাসের বিভীষিকা এবং শিল্প থেকে উৎসারিত সংগ্রামের আহ্বান।

"বুখেনওয়াল্ডের সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য ও সংগীত ছাড়াও আছে ছবি, গ্রাফিক, প্লাস্টিক এবং নানা জাতের হাতের কাজ। কঠোর এক অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও বন্দীরা লেগে যেতেন কিছু একটা সুন্দর সৃষ্টির কাজে। শিল্পের প্রতি কী ভালবাসাই না তাঁদের ছিল। এইভাবেই শিবিরের শিল্প হয়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী অস্ত্র যাকে ভিত্তি করে শিল্পীরা নিজেদেরও গড়ে তুলতেন এবং রক্ষা করতেন। বুখেনওয়াল্ড শিবিরে যে বন্দীরা এইসব শিল্পকাজ দেখতেন বা সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকতেন তাঁরাও প্রত্যেকে এসব থেকে জোর পেতেন এবং মনের মধ্যে জয়ের আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করে তুলতেন।"—ক্লাউসড্রোবিশ।

এস এস বাহিনী তাদের মতলব হাসিলের কাজে কারু শিল্পকেই নেকনজরে দেখত এবং বন্দীদের সৃজনক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাত। এবং, বলা বাহুল্য, অপব্যবহার করত। এই উদ্দেশ্যে বুখেনওয়াল্ড শিবির গড়ে ওঠার কয়েকমাসের মধ্যেই বার নম্বর ব্লকের তলায়, মাটির নীচে একটা আর্ট ওয়ার্কশপ তৈরি করা হয়। প্রতিভাবান বন্দীদের—ভাস্কর, হস্তশিল্পী, চিত্রশিল্পী, গ্রাফিক আর্টিস্টদের—বাধ্য করা হয় সেখানে কাজ করতে। নাৎসিদের অজ্ঞাতে শিবিরের বিধিসম্মত এই ব্যবস্থা বন্দীদের খানিকটা সুবিধা করে দেয়। তাঁরা গোপনে তাঁদের আসল এবং বেআইনি শিল্পকাজ করার কিছুটা সুযোগ পেয়ে যান। প্রাত্যহিক ত্রাসের হাত থেকে তাঁরা সাময়িকভাবে হলেও মুক্তি পেতেন, মৃত্যু দিয়ে ঘেরা ক্ষণিক নিরাপত্তা জুটে যেত।

ব্রুনো আপিৎজ বুখেনওয়াল্ড শিবিরের প্রাক্তন বন্দী। এখানে তিনি বহু অসাধারণ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি ছোট্ট একটি মূর্তি। ব্রুনো লিখেছেন :

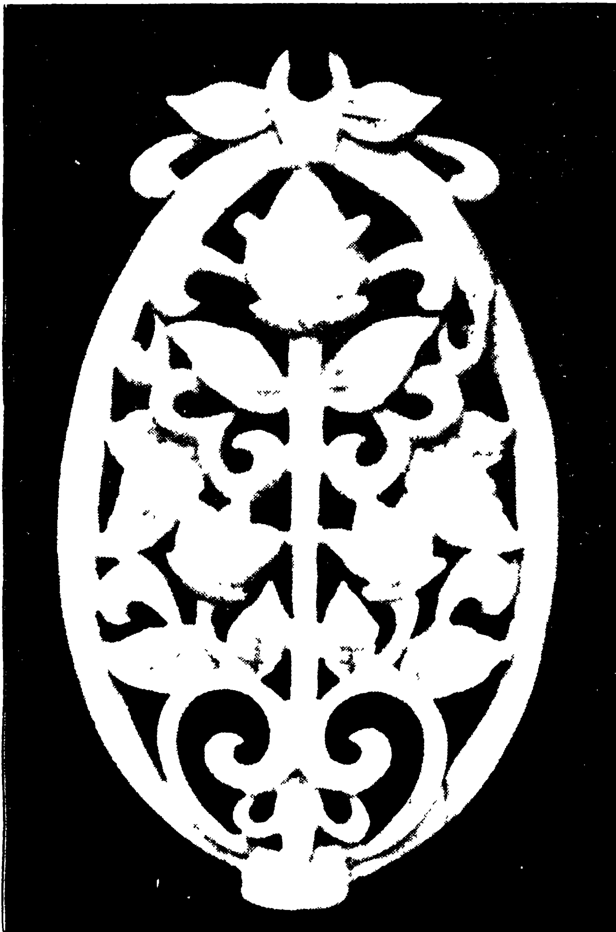
"বন্দীর বিপন্ন প্রাণ রক্ষার জন্য শিল্পনৈপুণ্যকে সক্রিয় হতেই হত। ছোট্ট এই মূর্তিটি তার জীবন্ত প্রমাণ। রাজনৈতিক বন্দীটির কাছে যন্ত্রপাতি বলতে ছিল ভাঁজ করা একটি ছুরি আর একটি ঝিনুক। তাই দিয়েই তৈরি করা হয় এই মূর্তিটি। বন্দীশিবিরের বীভৎস পরিস্থিতি এবং এস এস-এর অত্যাচারের ফলে একসময় স্রষ্টার মৃত্যু প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কমরেডরা যে তাঁকে সাহায্য করবেন সে ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দেন তাঁর শিল্পক্ষমতা কাজে লাগাতে, যাতে তিনি ওই আর্ট ওয়ার্কশপে কাজে যেতে পারেন। পরামর্শটা অর্থহীন। কারণ বন্দীটির শিল্পপ্রতিভা থাকলেও তিনি হাতের কাজ জানতেন না। বন্দীদের নিজস্ব সময় ছিল অল্প এবং খুবই কষ্টার্জিত। উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই সময়টুকু তিনি কাজে লাগাতেন একটুকরো প্লাস্টিকের পিছনে। খোদাইয়ের কাজ চলতে থাকে যতক্ষণ না এই মূর্তিটি তৈরি হয়। এই মূর্তিই শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যায় আর্ট ওয়ার্কশপে এবং তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।"

আর্ট ওয়ার্কশপের ভাস্কর্য বিভাগে ব্রুনো আপিৎজ চার বছর কাজ করেন। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে ছিল শিল্পপ্রতিভা এবং কমরেডদের জন্য লড়াই করার মন ও তেজ। ভাস্কর্য বিভাগে তাঁর কাজ ছিল লাইফসাইজ মূর্তি তৈরি করা। কিন্তু এস এস বাহিনী তাঁকে অন্যান্য কাজ করতেও বাধ্য করত। কারুকার্য খচিত কলমদানি থেকে রোড সাইন খোদাই, বোতলের বাহারে ছিপি তৈরি থেকে এক নাৎসি কম্যান্ডার, থুরিঙ্গেনের লোক, সাউকেল-এর দশম সন্তানের জন্য দোলনা বানানো পর্যন্ত সবই করাত তাঁকে দিয়ে। প্রতিভার এমন অপব্যবহার সত্ত্বেও বন্দীদের মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষার প্রত্যয় ধ্বংস করা যায় নি। ব্রুনো আপিৎজের খোদাই করা একটি লকেট তারই প্রমাণ। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই

লিখেছেন

"এটি একটি লকেট, যেমন মেযেবা পবে থাকে। দেখে মনে হবে এটি বোধহয় হাতির দাঁতের। আসলে এটা গোরুর হাড়েব একটা টুকবো থেকে তৈরি। টুকরোটা বন্দীটি এক আস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পায। আর্ট ওয়ার্কশপের ছুতোর মিস্ত্রীকে দিযে সেটা সে কাটিয়ে নেয়। যন্ত্রপাতি বলতে তাব কাছে ছিল খুব ধারালো একটা ছুবি, হাতে চালানো একটা ড্রীল, আর সরু একটা গোল ফাইল, তাই দিযেই সে খুব সতর্কভাবে নবম হাড়টা নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ওটা দিযে তার অনভ্যস্ত হাত কী কবতে চায ? ঠিক কী গড়তে চায় ? সান্ত্বনাহীন বন্দীজীবন, দশ বছবেব মেযাদ, এই অবস্থায নারীর অলঙ্কার তৈরি করা কি নিজেকেই বিদ্রূপ কবা নয ? এটা কি চাবপাশের ভযঙ্কর বাস্তবতা থেকে অর্থহীন এক স্বপ্নে পলাযনের প্রচেষ্টা নয ?

"একেবাবেই নয, বন্দী ত হতাশ এক স্বপ্নদর্শী নয়, বরং সে সুদৃঢ় এক রাজনৈতিক সংগ্রামী। তাহলে কি তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে হাড়েব টুকবোটাতে খোদাই করার জন্যে



সৃষ্টির তাড়না ? সৃজনের আনন্দ ? কোনো বাসনা ? প্রেম ?—সবকিছু মেলালে তবেই বোঝা যাবে, বন্দীর ভেতরের মানুষটা। আসল মানুষটা, নিজেকে গড়ে তুলছে, চারপাশেই ত মৃত্যু। তার মাঝখানে অনিবার্য জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে ছোট্ট ওই হাড়ের টুকরোটা এবং নিজের মত করে ওটা একটা সত্য প্রকাশ করছে, বর্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সত্য।

"শিবিরে আরো একটা ভাষা ছিল, শিল্পের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেওয়াব ভাষা ·· তোমরা আমাদের নত করতে পার না। আমরা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

"সেই ভাস্কর্য বিভাগেব একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে হের কম্যান্ডার একজন বন্দীর কাছে দাবি করে তাকে আহত এক সৈনিকের একটি মূর্তি তৈরি করে দিতে হবে—বীরের মূর্তি। নিজের নপুংসকতা ঢাকার জন্য শিবিরের এই রাজাটি নির্লজ্জের মত এক বীরের আড়াল চায়—এমন একজন বীর যাকে সে চোখেও দেখে নি। তার আদেশ অবশ্য পালনীয়। কিন্তু বন্দীর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই নাৎসি 'বীরত্ব'-কে মহিমান্বিত করার। বরং ঠিক উলটোটা। এই আদেশকে সে কাজে লাগাল নিজের ভাষায়, দাসের ভাষায়, কথা বলতে। একজন সহবন্দীকে সে নিয়ে এল মডেল হিশেবে। দুঃখ, যন্ত্রণা আর অবিরাম লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এবং কঠিন হয়ে যাওয়া সহবন্দীর শরীরই অপেশাদার শিল্পীর মডেল হয়ে উঠল। শিবিরের রাজা যখন খোঁজ করতে এল তখন শিল্পীর কর্মস্থলে তার সহবন্দীর আবক্ষ মূর্তি তৈরি—অর্ধনিমীলিত চোখ। কঠিন করে বন্ধ মুখ, কপালের উপর এলোমেলো চুল। মূর্তিটি দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, এর অন্তর্নিহিত অর্থ কী ? উত্তরে শিল্পী বলে যোদ্ধার মানবিক মহত্ত্ব এবং যন্ত্রণা ও বেদনাজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই ব্যাখ্যা একদা ব্যাঙ্ককর্মী শিবির রাজার মনে খুব ধরে। সে নির্দেশ দেয় মূর্তিটি যেন অফিসারদের ক্যাসিনোতে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে এস এস বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের সামনে একটা দৃষ্টান্ত থাকে। সেই থেকে এক বন্দী নীরবে বসে থাকে ক্যাসিনোতে। তার কপালের পাপে ক্ষত, ক্ষত থেকে ঝরছে রক্ত, পাথর-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে 'বীরদের' দিকে, সে দৃষ্টির সামনে তারা পরিণত হচ্ছে কীটে।"

কিন্তু গোপন শিল্পকর্মই ছিল আসল কাজ, শিবিরের কম্যান্ডার কোখ বদলি হয়ে গেলে তার জায়গায় পিস্টার এসেই যখন আর্ট ওয়ার্কশপ তুলে দেওয়ার আদেশ দিল, তখনো বন্দী শিল্পীরা তাঁদের গোপন শিল্পসৃষ্টির কাজ চালিয়ে যান। ব্রুনো আপিৎজকে এই সময় আর্ট ওয়ার্কশপ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্যাথলজি বিভাগে। এখানেই তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর 'শেষ মুখ'—কাঠ খোদাইয়ের কাজ, বুখেনওয়াল্ডের যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে ইমপ্রেসিভ কাজ। এর সৃষ্টির ইতিহাস তিনি নিজেই লিখেছেন :

"১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন বোমারু বিমানের আক্রমণে শিবিরের যুদ্ধাস্ত্রের গুদামটি ধ্বংস হয়ে যায়।

"এটি ছিল শিবিরের বাইরে। বোমা বর্ষণের ফলে ছড়িয়ে পড়া আগুনে গ্যেটের ওক গাছটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এত দিন গাছটি ছিল প্রকৃতির আশ্রয়ে। (বুখেনওয়াল্ড শিবিরে এই একটি গাছই টিকে ছিল। গাছটি ছিল শিবিরের লন্ড্রী ও বন্দীদের রান্নাঘরের মাঝখানে। কথিত আছে গ্যেটে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই আসতেন এখানে এবং এই গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে তৃপ্তি পেতেন)। গাছের গুঁড়ির একটা পাশ আগুনে একটু ঝলসে যায়। ফ্যাসিস্ট কম্যান্ডার আদেশ দেয় গাছটি কেটে ফেলতে। ছুতোরখানায় নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালাবার কাঠ তৈরি করার হুকুম হয়। এর থেকে এক টুকরো কাঠ নিয়ে আমি প্যাথলজি বিভাগে লুকিয়ে রাখি।

"পরে এক সময় কাঠের টুকরোটা শিবিরের এক নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাই এবং তা থেকে একটা মৃত্যু-মুখোশ তৈরি করি। কাজটা ছিল বিপজ্জনক। ধরা পড়লেই শেষ—অবধারিত বাংকার এবং অনিবার্য মৃত্যু। আমি যখন খোদাইয়ের কাজ করতাম শিবিরের সহবন্দীরা আমাকে আড়াল করে রাখতেন। একজন সহবন্দী সারাক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ামাত্র পরিষ্কার করে ফেলতেন। আরো একজন বন্দী পাহারা দিতেন। বিপদের গন্ধ পাওয়া মাত্র তিনি কাঠের টুকরোটা এবং আমার যন্ত্রপাতি লুকিয়ে ফেলতেন। আমাকে কাজ করতে হত খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে। কাঠের উপর রাফ খোদাইয়ের চিহ্নগুলিই তার প্রমাণ।

"কাঠের টুকরোটাতে রস ছিল। সেটাকে এমনভাবে তৈরি করে নিতে হয় যাতে পরে ফেটে না যায়। কাজ করা হয়ে গেলে দিনের পর দিন পাতলা চুন জলে চুবিয়ে রাখি। তারপর একটা ওয়াটারপ্রুফে মুড়ে রাখি।

"আমার অনুরোধে কয়েকজন সহবন্দী মৃত বন্দীদের কয়েকটি মৃত্যু-মুখোশ, প্লাস্টার অফ প্যারিস-এ তৈরি, যোগাড় করে আনেন। এগুলোই হয় আমার মডেল। [গ্যাসচেম্বারে পাঠানোর সময় বন্দীদের মুখে এই মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হত। ফলে তাঁরা বাধ্য হতেন মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে। এতে মৃত্যু দ্রুততর হত।—লেখক]। এইভাবে বহু মৃত মুখ থেকে তৈরি হয় একটি মুখ—যার নাম আমি দিই 'শেষ মুখ' যেকোনো সময় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আমরা তাই কাজটা শিবিরের বাইরে পাচার করে দিই। পাচারের কাজটি করেন সহবন্দী হাইন্‌স ডোজে। তিনি ছিলেন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ বিভাগের 'কাপো' [কাজ অনুসারে নির্ধারিত বন্দীর একটা পদ, বন্দী শ্রমিকদের একটি গ্রুপের সুপারভাইজাব।—লেখক]। মাঝেমাঝেই তাকে কেনাকাটার কাজে শিবিরের বাইরে পাঠানো হত। বলাই বাহুল্য এস এস বাহিনীর বন্দুকের নলের সামনে। সাতবার যাতায়াতের পর তিনি কাজ হাসিল করতে সক্ষম হন। আপোলডাতে তাঁর পরিচিত একটি পরিবারের কাছে তিনি কাজটি লুকিয়ে রাখেন। বুখেনওয়াল্ড মুক্ত হওয়া পর্যন্ত সেটি ঐখানেই লুকানো ছিল। মুক্তির পর ডোজে সেটা আমাকে ফিরিয়ে দেন।

"যন্ত্রণার জীবনের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে সংগ্রামীর মুখ যেন ঢুকে পড়েছে কাঠের মধ্যে—হল সেই জীবন যা জার্মান জনগণের প্রতিভার স্পর্শধন্য, যা পচাগলা জার্মান সংস্কৃতির হাতে বিনষ্ট—দিনের আলোয় যার প্রকাশ ছিল অনিবার্য, নোবল ইজ দ্য ম্যান, হেলপফুল অ্যান্ড গুড—গ্যেটের ওক গাছের এই শেষ টুকরোটা যেন সেই মৃত মানুষগুলির শেষ আশ্রয়, যাঁরা এই মহান শব্দকটির জন্য প্রাণ দিয়েছেন।"

বন্দীদের শিল্পকর্মের মধ্যে হস্তশিল্প একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। এর বেশির ভাগই তৈরি করা হয় এস এস বাহিনীর আদেশে। এ সম্পর্কে বুখেনওয়াল্ডের প্রাক্তন চেক বন্দী অ্যান্টনিন ওয়াইজার লিখেছেন :

"এটা উল্লেখ করা জরুরি, যে সব বন্দী এ ধরনের কাজ জানতেন তাঁদের প্রায় সবাইকে এস এস পরিচালিত সেরামিক আর্ট ওয়ার্কশপে কাজ করতে হত। সেখানে তাঁদের সেরামিকের কাজ, ছোট বড় মূর্তি থেকে এস এস কর্তাদের গৃহসজ্জার সরঞ্জাম পর্যন্ত নানা জিনিশ তৈরি করতে হত। এছাড়া 'বিশেষ মাননীয়' অতিথিদের জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রীও তৈরি করতে হত। এইসব কাজের গায়ে তাদের সৃষ্টির উৎসের ছাপ মারা থাকত—যথোপযুক্ত এক প্রতীক—আড়াআড়ি দু-টুকরো হাড়ের ওপর একটি করোটি⋯।

"শিবিরের বন্দীরা কিন্তু এসব সামগ্রী চোখেও দেখতে পেতেন না। তাঁদের পক্ষে এসব জিনিশ ছিল 'বড় বেশি ভাল'। বুখেনওয়াল্ডের অস্ত্র তৈরির কারখানায় ব্যবহৃত ধাতু থেকে



বন্দীবা নানান নিত্যপ্রযোজনীয জিনিশ তৈবি কবতেন, যেমন ইলেকট্রিক কুকিং প্লেট, লাইটাব, ছুবি-কাঁটা ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁবা কারুকার্য কবা সিগাবেট কেস, ব্রুচ, মেডাল আংটি ইত্যাদি বানাতেন। তাঁদেব কাছে এগুলি ছিল যেন চবম এই অসম্মানেব জীবনে সুন্দব ও আলোকময এক জগতেব প্রতি তৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ ।"

এই আর্ট ওযার্কশপে নিত্যপ্রযোজনীয জিনিশপত্রেব সঙ্গে সঙ্গে নানান ধবনেব দৃষ্টিনন্দন সামগ্রীও তৈবি হত। তাব মধ্যে ছিল বহস্যাবৃত প্রতীক খোদাই কবা একটি কাঠেব টুকবো। আব ছিল সবুজ বঙেব মর্মব পাথবেব এক কলমদানি। যাব দাম ছিল কুড়ি হাজাব বাইখস মার্ক। ১৯৩৯ সালে শিবিবেব কম্যান্ডাব কোখ এ দুটি উপহাব দেয তাব পৃষ্ঠপোষক বাইখসফ্যুযেবাব হিমলাবকে। নিজেদেব সম্পদবৃদ্ধি আব উপবওযালাকে ঘুষ দিযে খুশি কবাব কাজে বন্দীদেব সৃষ্টি কবা শিল্প ব্যবহাব কবতে এস এস-এব ফ্যাসিস্টবা ছিল খুবই

আগ্রহী। প্রায়ই তারা এইসব সৃজনশীল প্রতিভাকে তাদের বিকৃতরুচির জার্মানি ভক্তি ও জাত্যভিমানের সেবায় লাগাত।”

এই সম্পর্কে বুখেনওয়াল্ডের এক বন্দীর স্মৃতিচারণা :

“আর্ট ওয়ার্কশপের শিল্পকর্মের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভাস্কর্য বিভাগে তৈরি ভাইকিং জাহাজ, বাণিজ্য জাহাজ এবং প্রাচীন জার্মান পালতোলা নৌকার খোদাইয়ের-কাজ। এগুলি তৈরি করতে অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ কারিগরি প্রতিভার প্রয়োজন হত। দেখে মনে হত যেন মেশিনে তৈরি। দুর্নীতিপরায়ণ এস এস কর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য এগুলির খুব চাহিদা ছিল।

“খাঁটি জাতের প্রতিটি এস এস সদস্যের একটি বংশবৃক্ষ থাকবেই, খাঁটি গণ্য হতে হলে থাকতেই হবে। যার নেই তাকে বানিয়ে নিতে হবে। এই কাজে লাগানো হল একদল বন্দীকে। তাঁদের অধিকাংশই চেক। এঁদের কাজই ছিল বিবাহ, মৃত্যু ও জন্মের রেজিস্ট্রি অফিস এবং চার্চের মহাফেজখানা তোলপাড় করে এস এস-দের বংশপরিচয় খুঁজে বের করা। জন্ম ও বংশ নিয়ে এই গবেষণা করতে গিয়ে প্রায়ই অদ্ভুত সব তথ্য বেরিয়ে পড়ত। এক বা দুই পুরুষ আগে বাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল না। যদিও বা অনেক খুঁজে পেতে উধাও জনকের খোঁজ পাওয়া গেল, দেখা গেল তার নিজের জন্মবৃত্তান্তই বেশ সন্দেহজনক। এইরকম একজন বাপহীন ‘অভিজাত’ ছিলেন কুখ্যাত এস এস ট্রুপ-ফ্যুয়েরার ডঃ এরভিন ডিং-শূলার। তার জন্মদাতা ব্যারন ফন শূলার, এরভিনের মা ব্রাউন নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করতে ঘোর আপত্তি জানান। যদিও হের ব্যারনের ওই মহিলার গর্ভজাত আরো দুটি সন্তান ছিল, এরভিন ছাড়াও। শেষপর্যন্ত এরভিন ব্রাউনকে লাইপজিগে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে দত্তক নেওয়া হয় এবং তার নাম হয় এরভিন ডিং। আদিতে সে ছিল এস এস বাহিনীর অ্যাকশন গ্রুপে। সেখান থেকে সে এস এস বাহিনীতে যোগদান করে। এখানে সে শিবিরের ডাক্তার হিশেবে যোগ দেয় এবং পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে লাগে। শেষপর্যন্ত অবশ্য রাইখসফ্যুয়েরার হিমলারের সাহায্যে সে পৈতৃক স্বীকৃতি পাওযার সাধনায় সফল হয়।

“কিন্তু শুধু বংশবৃক্ষ হলেই ত চলবে না, একটা কুলচিহ্নও দরকার। এই কাজে আমাদের চেক কমরেডদের তাঁদের সমস্ত কল্পনাশক্তি উজাড় করে দিতে হয়েছিল। সোনা, রুপো, আর ব্রোঞ্জের চমৎকার সব কুলচিহ্ন সৃষ্টি করতে—যাতে সেগুলো এস এস কর্তাদের পছন্দসই হয়, এই কুলচিহ্নগুলিকে আবার এস এস-এর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টারে অভিজাতদের কুলচিহ্নের রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করা হত।

“ফাল্কেনহোফ তৈরি করার পেছনে আর্ট ওয়ার্কশপের অবদান ছিল অসীম। এটি ছিল অতি বিশাল কাঠের একটা হল ঘর, খোদাই করা বেঞ্চি এবং টেবিল দিয়ে সাজানো।

“এস এস পোশাকধারীরা এখানে ভাল্লুকের চামড়া গায়ে দিয়ে আদিম জার্মান সাজত এবং মদ্যপান করত। লোকে বলে, ফাল্কেনহোফ তৈরি করতে খরচ হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ মার্ক এবং কয়েকডজন মানুষের প্রাণ। ১৯৪৩-এর ২৪ আগস্ট বোমারু বিমানের আক্রমণের শিকার হয় ফাল্কেনহোফ।” [ফাল্কেনহোফ কথাটির অর্থ বাজপাখির বাসা।—লেখক]।

বুখেনওয়াল্ড শিবিরের কর্তাদের বসতির খুব কাছে তৈরি হয় এই ফাল্কেনহোফ—হিমলারের প্রত্যক্ষ আদেশে এটি তৈরি করা হয়। অয়গেন কোগোন-এর কথায় :

"ফাক্কেনহোফ ছিল শিবিরের জমকালো প্রাসাদ—যার ঠিক পিছনেই সর্বগ্রাসী চরম দুর্দশা।" মধ্যযুগীয় কায়দায় এখানে শিকারের জন্য একটা পশুনিবাসও গড়ে তোলা হয়। [মধ্যযুগে ট্রাইবাল রাজারা শিকার করার জন্য ব্যবহৃত হবে এমন পশুদের একটা নিবাস গড়ে তুলতেন। উদ্দেশ্য, যে পশু শিকারের বাসনা, সেটাকে যেন সহজেই পাওয়া যায়। শিকারের আগে পশুটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে তার পিছনে তাড়া করে মারা হত— লেখক]। এখানে শিকারি পাখিদের জন্য দুটি ঈগলগৃহ এবং একটি বাজপাখির ঘর ছিল। ওক গাছের গুঁড়ি কেটে মাটির ঘরের কায়দায় এগুলি তৈরি করা হয়। সেইসঙ্গে ঘেরা জায়গায় থাকত হরিণ, রো, স্নাউট, বুনো শুয়োর, শেয়াল এবং অন্যান্য নানা জাতের স্থানীয় জীবজন্তু। আর ছিল একটা জু গার্ডেন। এতে থাকত বাঁদর, ভাল্লুক, এমনকী গোড়ার দিকে গণ্ডারও। যুদ্ধের মধ্যে নিদারুণ অনটনের সময়েও এদের খাওয়ানো হত ফল, শাদা রুটি, দুধ ও মধু, এমনকী প্রচুর পরিমাণ মাংসও। এসবের অনেকটাই আসত বন্দীদের রান্নাঘর থেকে। পশুরা খেয়েদেয়ে বেশ নধরকান্তি হয়ে উঠত, আর একটু দূরেই শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে থাকত হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষ।

"শিবিরের দশটি 'ফ্যুয়েরার হয়জার' অর্থাৎ ট্রুপলিডারের বসতবাড়ি ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বাহারে বাড়িটি ছিল শিবির কম্যান্ডার কোখ-এর। এগুলি সবই বন্দীদের বাধ্যতামূলক শ্রমে তৈরি। একই পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হয় ফাক্কেনহোফ। তার উপর ছিল সেগুলির ভেতরের সাজসজ্জার কাজ, হাতে তৈরি আলোকদান, অমূল্য কাঠের ফার্নিচার, কারুকার্য করা মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিশ ছাড়া কিছুই রুচত না কর্তাদের। সেসব জিনিশও চলনসই বলে বিবেচনা করা হত : ক্রোমিয়াম, নিকেল, ভোলফরাম, মলিবডেনাম, স্টিল, সবচেয়ে দামি রং আর ইট এবং কাঠ। এইসব জিনিশ দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্র ও শিল্পকর্ম তৈরি করতে যে কারিগরি এবং সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়োজন হত, তা পাওয়া যেত একেবারে নিখরচায়।

"এস এস বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের লোকেরা তাদের র‍্যাংক অনুযায়ী ফায়দা লুটত। একজন সাধারণ স্তরের এস এস সদস্য হয়ত বন্দীকে দিয়ে করিয়ে নিত মলিবডেনাম ইস্পাতের একটা ছোরা। শিবির কম্যান্ডান্ট করিয়ে নিত এক কোটিপতির ঘরের আসবাবপত্র। প্লেটুন লিডার দশ বিশ হাজার মার্ক কামাতেন। স্টর্ম ট্রুপ লিডার কামাতেন লাখের কাছাকাছি এবং আরো উঁচুতলার অফিসাররা জানতেনই না কোথায় তাঁদের ঊর্ধ্বসীমা।" (ওয়াল্টার ও পোলার।)

হস্তশিল্পের জন্যে ঢালাই ও কাঠের কাজ বেশির ভাগই করা হত শিবিরের কাছেই অস্ত্রনির্মাণ কারখানার ছুতোরখানায় এবং মেকানিকাল বিভাগে। প্রাক্তন জার্মান বুখেনওয়াল্ড বন্দী এরিক হাজে এ বিষয়ে লিখেছেন :

"আমি জার্মান অস্ত্র তৈরির কারখানায় মেকানিকের কাজ করতাম। আমার কাজ ছিল হাওয়া চলাচলের জাল এবং বারান্দার গ্রিল তৈরি করা। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্মের কাজেও আমাকে এবং আরো কিছু কমরেডকে ব্যবহার করা হত। আমরা এস এস-এর জন্যে বাতিদান, ছাইদান এবং অন্যান্য নানা জিনিশ তৈরি করতাম। আমাদের ওপর তাদের বাড়ি সাজানোর ভারও পড়ত। এসব কাজে কেবলমাত্র সেরা জিনিশপত্রই ব্যবহার করা হত।

"এইভাবেই আমাদের দিয়ে একগাদা চিমনি তৈরি করানো হয়। সাধারণ চিমনি নয়, শুধু ওপরের আবরণ নয়, গোটা ব্যাপারটাই ছিল অসাধারণ। ঢালাই করে, জুড়ে প্রাচীন জার্মান স্টাইলে তৈরি। সবটা মিলে রীতিমত শিল্পকাজ। শিবির কম্যান্ডার কোখ-এর বাগানে

দেওয়ালের জন্যেও আমরা নানান ঢালাই শিল্পের কাজ করি। দেওয়ালটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, মাটি থেকে একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটিকে দুর্গের মত দেখাত।

"ফাল্কেনহোফ সাজানোর কাজেও আমাদের বড় অংশ ছিল। একশ কিলোগ্রাম ওজনের ঝাড়বাতিটি আমরাই যোগাই। বাজপাখির ঘরটি সাজানো ছিল অনেকগুলো ঝাড়বাতি ও ঢালাই শিল্পকর্ম দিয়ে। সেসবও আমাদের করা। ১৯৪৩ সালে বেশ কিছু খ্যাতনামা লোককে এখানে বন্দী করে রাখা হয়—ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিও ব্লুম, এডওয়ার্ড দালাদিয়ের প্রমুখ। শিল্পী মেকানিক হিশেবে আমি তৈরি করি টর্চলাইট, দেওয়ালে লাগান মশালাকৃতি বাতিদান। বড় ঝাড় শুধু অনেকে মিলেই তৈরি করা যায়।

"যুদ্ধের মধ্যে রাভেনসব্রুকের এবং এস এস চিফ সেকশন লীডার তার বাড়ি তৈরি করাচ্ছিল। তার প্রযোজন হল আমাদের শিল্পের। তার বাড়ির জন্য কলমদান, বাতিদানসহ লেখার নানা সরঞ্জাম তৈরি করতে আমাদের বাধ্য করা হয়। বুখেনওয়াল্ড শিবিরের প্রবেশদ্বারটিও শিবিরের মেকানিকাল বিভাগের কর্মীরা তৈরি করেন।

"এইসব কাজের পাশাপাশি এস এস-এর জন্যে তৈরি বন্দীশিবিরের কাজগুলির কথা ভুলে গেলে চলবে না। বিশেষত ফাল্কেনহোফের জন্যে তৈরি খোদাইয়ের কাজগুলি এবং 'ক্যারাচো ওয়েগ'-এর রোড সাইনটির কথা। [শিবির কম্যান্ডারদের বসতি এলাকা এবং বন্দীশিবিরের গেটের মাঝখানের রাস্তাটির ছিল এই নাম। এই রাস্তা দিয়ে বন্দীদের খুব দ্রুত গতিতে এবং পেটাতে পেটাতে নিয়ে যাওয়া হত। সেইজন্যই রাস্তাটির এই নাম দেওয়া হয়। বন্দীদের ভাষায় এটি ছিল 'স্ট্রিট অফ ব্লাড'— লেখক]। খোদাইয়ের কাজগুলি প্রায়ই ভরা থাকত সিনিক্যাল লেখা দিয়ে, অবশ্য বলাই বাহুল্য, কাজগুলি হত ফ্যাসিস্টদের অনুমতিসাপেক্ষে। এগুলি যেমন আমাদের কর্মক্ষমতার নিদর্শন, তেমনি আদেশ-কর্তাদেরও মূঢ়তার দৃষ্টান্ত। কারণ লেখাগুলির আসল অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত ভিন্ন। যেমন, ১৯৪৪ সালে বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত গুস্টলফ্ কারখানার একটি অ্যাম্বুলেন্স মেরামত করার পর বন্দীরা তার দরজায় লিখে দিলেন :

'ছুরির সাথে চলছে
তবু উন্মাদ ঝড়ের লড়াই,
আমরা ভাবি আমাদের কর্তব্যের কথা,
জানি ক্ষত নিরাময়
হয়, দ্রুত হয়
আঘাতে আঘাতে।'

"এস এস জানতে চায় এটা কার উক্তি। আমরা চোখ বুজে বলে দিই, গ্যেটের, আমরা প্রত্যেকেই ত এক একজন গ্যেটে।

"যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তে থাকলে ফ্যাসিস্টদের আমাদের কাজ নিয়ে চাল-মারা কমিয়ে দিতে হয়, কারণ তখন যাবতীয় মালমশলার প্রতিটি আউন্স যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির কাজে লাগানোর দায়, অথচ তা সত্ত্বেও কারুকার্যখচিত ঢালাইয়ের জিনিশ তৈরির ঢালাও অর্ডার আসতেই থাকে। এইসব কাজের জন্য আমরা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দস্তা, তামা, স্টিলের চাদর ইত্যাদি চেয়ে নিতাম। লোহা বার্নিশ করার জন্য আমরা চেয়ে নিতাম ভাল মানের তিসির তেল। এই তেলের স্নেহ পদার্থ খেয়ে আমরা চেষ্টা করতাম খাদ্যাভাবে কাহিল আমাদের শরীরের ক্ষয় মেটাতে। বেশ কিছু কমরেড এই প্রসঙ্গে আমাদের শিল্পী-মেকানিক বন্ধুদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করতাম সাধারণ তেল।

"প্রায়ই আমরা সহবন্দীদের জন্যে নানা উপহার তৈরি করতাম, যেমন লাইটার এবং পকেট-ছুরি। বিশেষ করে আমাদের চোখ থাকত সহবন্দীর জন্মদিনটির দিকে। একটি দিন যেন সুন্দর হয়। আমার কাছে আজও একটা কার্ড আছে, ডুইসবুর্গের আডলফ ফ্রেনৎসেল-এর আঁকা, জন্মদিনের শুভেচ্ছাসহ বার্থডে কার্ড। আর আছে আমার চেক সহবন্দী পাটার আঁকা একটি ছবি। কালি দিয়ে কলমে আঁকা একটি ড্রইং, তার নাম সিংগিং হর্স। শিবির মুক্তির পরে বুখেনওয়াল্ডে তৈরি আর একটি ছবির কথা মনে করতে খুব আনন্দ হয়। এটির জন্য আমি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এক সার্জনের কাছে কৃতজ্ঞ। এটি একটি পরিবারের ছবি। ছবিটি এখন আমার বসার ঘরে খুব মর্যাদার সঙ্গে সাজানো আছে। এর মডেল হিশেবে ব্যবহার করা হয় আমার স্ত্রীর ও পুত্রের একটি পুরনো ছবি। ছবিটি তৈরি করা হয় শিবিরের ট্রিকস রুমে।

"তিন সপ্তাহ খাটুনির পর আমার সবচেয়ে সুন্দর কাজটি তৈরি হয়। গোল একটা ছাইদান। এর অর্ধেকটা ছিল সিগারেটের টুকরো ফেলার জায়গা। এই অংশেও যথেষ্ট কারুকার্য ছিল। মাঝখানে ছিল একটি নেহাই এবং লাঙলাকৃতি একটি হাতুড়ি। ছাইদানিটির গায়ে আমি খোদাই করে দিই মজুরদের গানের কয়েকটি কথা…

যেখানে মুক্ত হাত লাঙল চালায়
সেখানেই বীজ
সেখানে ফসল :
সেখানে মুক্ত হাত হাতুড়ি পেটায়
শব্দ আসে সতেজ আঘাতের,
যেন গান…

"এস এস-রা তাদের অজ্ঞতার জন্য কথাগুলির গভীর অর্থ ধরতে পারে নি। ছাইদানটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত শিবির কারখানার ম্যানেজার সেটি তার বাড়িতে নিয়ে যায়।

"সবচেয়ে বড় আর সুন্দর কাজ ছিল একটি কলমদান। তিনজন বন্দী তিন মাস ধরে খেটে এটি তৈরি করেন। কলমদানটি ছিল খুব বড়। তার গায়ে খোদাই করা ছিল আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। কালিদান, চিঠি, খেলার ছুরি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অংশগুলি ছিল আফ্রিকার জন্তু জানোয়ারের মত দেখতে—যেমন হাতি, সিংহ ইত্যাদি।"

এই বাধ্যতামূলক শিল্পকর্মের মধ্যে বন্দীদের অন্তর কী সান্ত্বনা পেত তার বিবরণ পাওয়া যায় শিবির কমিটির ১৯৪৫ সালের একটি রিপোর্টে :

"দীর্ঘ বন্দী জীবনে বহু রাজনীতিসচেতন কমরেডের কাছে একটি নেহাই, ভাইস বা লেদ মেশিনের পাশে দাঁড়ানোটা ছিল এক আনন্দের ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের অনুভূতি। বলাই বাহুল্য, কারখানার কর্তৃত্ব ছিল অজ্ঞাত ও অনভিজ্ঞ এস এস-এর হাতে, যদিও তারা নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে চাল মারত। নিজেদের কর্মনৈপুণ্য কাজে লাগানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সজাগ দৃষ্টি রাখা যাতে ফ্যাসিস্টরা এই কর্মনৈপুণ্যের দিকটা শিখে না ফেলে—এই দুটোকে মেলানো ছিল বন্দীদের কাছে এক দুরূহ কাজ।

"গোড়ার দিকে বন্দীদের কেবল এই শিবিরের জন্যই প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হত। এসব ঠিকমত করার সঙ্গে বন্দীদের নিজেদের স্বার্থও জড়িত ছিল। যেমন, ঠিকঠাক বন্ধ হয় এমন দরজা বানানো বা লোহার সিঁড়িতে মজবুত করে রেলিং বসানো অথবা জলনিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা—এগুলি সকলেরই উপকারে লাগত। মন দিয়ে এইসব কাজ করার সঙ্গে বন্দীদের অতীত জীবনের আদর্শ ও কাজকর্মেও কোনো সংঘাত ছিল না। হস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে

পরবর্তীকালে যখন একগাদা লোহার বাতিদান, চিমনি ও তার আনুষঙ্গিক আংটা ও আংটাদানি—সবই কারুকার্যখচিত, কাজ করা জালনার জাল, আলমারি, কলমদান, ছাইদান, চিঠি ফেলার বাক্স ইত্যাদি তৈরি করতে হয়, তখনো লোকে এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি। এসব ক্ষেত্রে বন্দীদের কর্মতৃষ্ণা এবং আবিষ্কার করার প্রতিভা ছিল সীমাহীন।

"এ সময় এমন সব কলমদান তৈরি করা হয় যা বানাতে দুজন কারিগরকে মাসের পর মাস খাটতে হয়েছে, এগুলি বন্দী কর্মীদের কর্মক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব নিয়ে এস এস রা চালবাজি করত। কিন্তু যুদ্ধ চলছে এমন একটা সময়ে রণনীতির দিক থেকে এ ছিল এক অচিন্তনীয় অপদার্থতা। কারণ বাইরে তখন দক্ষ শ্রমিকের অভাবে হা-হুতাশ চলছে। বলা হচ্ছে লোহার প্রতিটি কিলো অত্যন্ত জরুরি ; অথচ শিবিরে অসাধারণ দক্ষতার নিদারুণ অপচয় ও জিনিশপত্রের চূড়ান্ত অপব্যবহার ঘটছে। এক এস এস নেতার বাড়ির জন্য বন্দীদের দিয়ে করানো হচ্ছিল একশ কিলো ওজনের একটি বাতিদান। বাতিদানটি তৈরি করার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সেটির ডিজাইনারের টনক নড়ল যে সে তার মূল নকশায় কিছু ভুল করে বসে আছে। ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি নিয়ে বন্দীরা শুরু করলেন নতুন বাতিদান তৈরি করার কাজ।

"হস্তশিল্পের এই পর্ব চলে ১৯৪৩ সালের গোড়া পর্যন্ত। এর পরেও অনেক ছাইদান, মোমদান এবং সিন্দুক তৈরি করানো হয়। কিন্তু উপর তলার আমলারা পরিদর্শনে এলে সেগুলি লুকিয়ে ফেলা হত। তার আগে পর্যন্ত এস এস রা সমস্ত শিল্পকর্মই তাদের সম্পত্তি হিশেবে রীতিমত জাহির করত এবং চাল মারত। স্ট্যালিনগ্রাড যুদ্ধের পরেই সমগ্র অর্থনীতিতে বন্দীরা অতি জরুরি শ্রমশক্তি হয়ে ওঠে…।"

যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় মূল্যবান ধাতুর অপচয়ের মাধ্যমে অস্ত্রনির্মাণের কাজ পরিকল্পনামাফিক স্যাবোতাজ করার খবর আরো একটা রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। এটিও ১৯৪৫ সালে লেখা। এস এস সেকশন লীডার পোল তার কুকুরের জন্য মূল্যবান পেতলের একটি খাঁচা তৈরি করার হুকুম দেয়। বন্দীরা রীতিমত আগ্রহের সঙ্গে এই হুকুম তামিল করতে লেগে যায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মালমশলা অপচয় করাটা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বন্দীদের স্লোগান ছিল : 'শিবিরের জন্য সব করো— অস্ত্র তৈরির জন্য কিছু না।' একটা ছোট্ট পেরেক থেকে শুরু করে উঁচু মানের ইস্পাত এবং অস্ত্র তৈরির জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ মিশেল ধাতু—সব কিছুর ক্ষেত্রেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। সমগ্র যুদ্ধকাল জুড়ে বন্দীরা সেরা ধাতু ও মিশেল ধাতুর ছাইদান, লাইটার, সিগারেট কেস ইত্যাদি তৈরি করতেন। প্রায়শই এইসব কাঁচামালের যোগানের জন্যে এস এস-এর কাছে আর্জি করা হত। আর এস এস-এর ফ্যাসিস্ট 'দেশপ্রেমিকরা' এই সব জিনিশ দিয়ে তৈরি সামগ্রী নিয়ে রমরমা ব্যবসা চালাত।"

বাধ্যতামূলক শিল্পকর্মকে বন্দীরা কতভাবে নিজেদের পরিকল্পনার কাজে লাগাতেন তার প্রমাণ একটি উদাহরণ থেকে পাওয়া যায়। বন্দীদের গোপন সামরিক পরিকল্পনা বিভাগ 'রোহলিং'-এর নির্দেশে উঁচুমানের ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয় চিঠি খোলার ছুরি, এরপর গ্যালভানাইজিং বিভাগের শান দেবার মেশিনে এগুলিকে ধার দিয়ে তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরধার করে তোলা হয়। ছুতোরখানা থেকে তৈরি হয়ে আসে ছুরিগুলির হাতল। শক্ত এবং ধারালো এই ছুরিগুলিকে 'রোহলিং'-এর নির্দেশে বন্দীরা লুকিয়ে রাখেন আগামী সেই দিনের জন্যে যেদিন বন্দীরা নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

গোড়ার দিকে হস্তশিল্পের যে ভূমিকা ছিল পরবর্তীকালে তা অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে ওঠে। শিবিরের গোটা সাংস্কৃতিক জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে প্রাক্তন চেক বুখেনওয়াল্ড বন্দী ডিওনাইজিউস পোলানস্কি লিখেছেন :

"অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে বন্দীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা দিত এক অবসাদ-ভরা হতাশা। এর মোকাবিলা করার জন্যে দাবা খেলা ছিল এক আদর্শ অস্ত্র। এই খেলাকে কেন্দ্র করে বন্দীরা নিজেদেরকে নানাভাবে মগ্ন রাখতেন—দাবার ঘুঁটি তৈরির কাজে নতুন জিনিশের প্রতি উদ্দীপনায়, দাবা খেলার তত্ত্ব, প্রয়োগ এবং ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনায়, দাবার প্রতিযোগিতায় এবং শেষপর্যন্ত দাবার অলিম্পিয়াড নিয়ে।



"গোড়ার দিকে ঘুঁটিগুলি তৈরি করা হয় পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে। সামান্য যেটুকু রুটি জুটত তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। পরের দিকে সেগুলি কাঠ কেটে বানানো হয়, এগুলি ছিল আংশিকভাবে কারুকার্য করা খোদাই কাজ বিশেষ। কর্মদক্ষতার জন্য কিছু বন্দী ছিলেন 'কিছুটা সুরক্ষিত'। এঁদের সব সময়েই নাৎসিদের কারখানায় বিভিন্ন মেশিনে কাজ করতে হত। এরা পরবর্তীকালে তৈরি করে দিতেন ধাতুর ঘুঁটি ও দাবার ছক। অবশ্যই গোটা ব্যাপারটা ঘটত গোপনে। এস এস-এর নজর এড়িয়ে।

"দাবাখেলা আমাদের ব্লকের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অঙ্গ হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত হয় শিবিরের প্রথম দাবা-অলিম্পিয়াড। ১৯৪২ ও ১৯৪৪ সালে পরবর্তী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে বন্দীদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কেবল সম্ভবই নয়, প্রয়োজনও হয়ে পড়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করেন বিভিন্ন দেশের ও জাতির মানুষ—সোভিয়েত জার্মান, ফরাসি, ইটালিয়ান, ডাচ, বেলজিয়ান, পোলিশ, চেক এবং অন্যান্যরা। প্রথম অলিম্পিকের উদ্বোধনী সংগীত আমারই লেখা। প্রতিযোগিতার আসল উদ্দেশ্য ছিল খেলা নয়, গোপন রাজনৈতিক মন্ত্রণা।"

আর্ট ওয়ার্কশপ, মেকানিকাল বিভাগ, ও ছুতোরখানার পাশাপাশি বই বাঁধাই লাইব্রেরি বিভাগও হয়ে ওঠে শিল্পকর্মের আর এক কেন্দ্র। বুখেনওয়াল্ডের প্রাক্তন বন্দী আলফ্রেড ওট-এর জবানিতে :

"১৯৩৭-এর নভেম্বরে যখন আমাকে বুখেনওয়াল্ড শিবিরে চালান দেওয়া হয়, তখন সেখানে ছিলেন প্রায় ২০০০ বন্দী। বই বাঁধাই (লাইব্রেরি বিভাগে) সে সময় কাজ করতেন তিন জন ; লেখক/করনিক রুডলফ্ আপিৎজ, ছাপার কাজেব জন্য ফ্রিৎজ বোগাডেন এবং লাইব্রেবিযান ওযাল্টার ইজেমান। তিনজনই ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। ১৯৩৮-এর জানুযারিতে আমাকে পাঠানো হয় এঁদের সঙ্গে বুক বাইন্ডার হিশেবে কাজ করতে।

"বই বাঁধাই কারখানাটি ছিল ১ নং ব্লকে। সাথেই ছিল বন্দীদের লেখার ঘর, পোস্ট অফিস এবং নির্মাণ সংক্রান্ত অফিস, আমাদের কারখানার সাজসরঞ্জাম ছিল একেবারে আদিম। যন্ত্রপাতি বলতে ছিল একটি হাতে চালানো ছোট প্রেস, ছুরি, কাঁচি আর কাগজ ভাঁজ কবার একটি যন্ত্র। আমি আসার আগে এখানে তৈরি হত শুধু শিবির চালক এবং ক্যাপোদের জন্য নোটিশ বুক আর গেট পাশ ইত্যাদি। আমাকে বুক বাইন্ডার হিশেবে নিযোগ করার পর আদেশ আসে উঁচুমানের কাজ করার জন্য। হুকুম হল শিবিরের মোট ৪০ জন অফিসারের জন্য ক্যালিকো আর কৃত্রিম চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা পকেট ডায়েরি তৈরি করাব। তাছাড়া শিবির প্রধান কোখ-এর আদেশে তৈরি করা হল কোখ-এর নিজস্ব ভিলার জন্য একটি গেস্ট বুক শুয়োরের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা খাতাটির মলাটের উপর রুপো দিয়ে স্বস্তিক চিহ্নখচিত, খাতার চার পাশ পাতলা সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। গেস্ট বুকের প্রথম পাতাটি ছিল নানান কারুকার্য করা লিথোগ্রাফি দিয়ে ভরতি। এই কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় ছাপাখানার নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। এই থেকেই তৈরি হয় বন্দী শিবিরের লিথোগ্রাফিক প্রেস।

"এই কাজগুলি শেষ করার পর শিবির কম্যান্ডার এবং অন্যান্য অফিসারদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কাজের আদেশ আসতে লাগল। যেমন, নির্দেশ এল শুয়োরের চামড়া দিয়ে মোড়া বেশ কয়েকডজন ফটো অ্যালবাম তৈরি করার। এছাড়া শিবিরের এস এস কম্যান্ডোর সান্ধ্য বৈঠকের একটি পত্রিকা ছাপার আদেশ এল। পত্রিকাটিতে নানা ধরনের ছবি ছাপা হয়েছিল, এর নাম ছিল 'পেলিক্যান'। তাছাড়াও এস এস-এর রাজনৈতিক বিভাগ এবং রেজিস্ট্রি অফিসের নির্দেশে বাঁধাই করা হত নানান আকারের রেজিস্ট্রি খাতা। এসবের ফলে ছাপাখানার এবং বই বাঁধাইয়ের কাজ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং বিভাগটি আরো বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের বিভাগের 'ক্যাপো' কিছু মেশিনপত্র এবং লোকজন চেয়ে দরখাস্ত করলে তা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মঞ্জুর হয়ে যায়। চলে আসে একটি কাগজ কাটার মেশিন। একটি বোর্ড কাটার মেশিন এবং একটি লিথোগ্রাফিক প্রেস। ১৯৩৮ সালে বই বাঁধাই তথা লাইব্রেরি বিভাগের কর্মীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায়

এগারয়। দুজন বুক বাইন্ডার, একজন কেরানি, দুজন লিথোগ্রাফার, একজন লিথোপ্রেস অপারেটর, একজন গ্রাইন্ডার, একজন প্রেস অপারেটর, দুজন লাইব্রেরিয়ান এবং একজন কাপো।

"শিবিরের লাইব্রেরিটিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ইতিমধ্যে বুখেনওয়াল্ড শিবিরের ফ্যাসিস্টরা দশ থেকে এগার হাজার বন্দীদের ধরে আনে। ফলে মোট বন্দীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় পনের হাজারে। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ছেঁড়া-ফাটা বইগুলি বন্দীরা নিয়মিত মেরামত করতেন।

"এই ছাপা-বাঁধাই বিভাগের কর্মীদের একটা বড় অংশকে এস এস অফিসারেরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করত। যেমন নির্দেশ আসত কারুকার্য করা জন্মদিনের কার্ড ছাপবার বা কোনো ফ্যাসিস্ট অফিসারের বংশবৃক্ষ ছেপে দেওয়ার। কখনো বা ছাপতে হত এস এস-এর কোনো অফিসারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি উৎসর্গ করা কার্ড। একবার নির্দেশ এল এক এস এস ডাক্তারের ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য লেখা থিসিসটি ছাপবার। থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'উল্কি' (TATOOING), ছোট বইয়ের আকারে প্রায় এক হাজার কপি ছাপাও হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় সেটিকে ডক্টরেট স্বীকৃতি না দেওয়ায় নির্দেশ আসে বইগুলিকে কাগজের মণ্ড তৈরি করার কাজে চালান দিতে। ১নং ব্লকে জায়গার অভাবের জন্য ১৯৩৯ সালের



গোড়ায় আমাদের বই বাঁধাই তথা লাইব্রেরি বিভাগটিকে ৪নং ব্লকে নিয়ে আসা হল। ঐ বছরের শেষে প্রায় তিরিশজন বন্দী এখানে কাজ করতেন। বেশিরভাগ কাজই হত এস এসদের ব্যক্তিগত শখ পূরণের জন্যে। যেমন শিবির কম্যান্ডার কোখের পরিবারের প্রত্যেকের একটি করে নিজস্ব ফটো অ্যালবাম ছিল। এমন কি এই পরিবারের কোলের শিশুটিরও নিজস্ব অ্যালবাম ছিল। কয়েকসপ্তাহ অন্তরই নতুন নতুন অ্যালবামের জন্যে আদেশ দিত তারা।"

এই বই বাঁধাই লাইব্রেরি বিভাগের বন্দী সদস্যরা কিন্তু শুধু এস এস-এর জন্যই কাজ করতেন না। এ ক্ষেত্রেও বৈধ সুযোগগুলিকে কাজে লাগানো হত, বন্দীদের স্বার্থে কিছু করার জন্যে। যেমন সুযোগ বুঝে গোপনে ছাপানো হত নানা জাতির সহবন্দীদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ড, কারুকার্য করা শ্রদ্ধানিবেদন ইত্যাদি।

এসব থেকে বুখেনওয়াল্ড শিবিরে বন্দী মানুষগুলির বহুমুখী প্রতিভার একটা সার্বিক ছবি পাওয়া যায়। এস এস কর্তৃক জোর করে আদায় করা শিল্পকর্মগুলি ছাড়াও বন্দীরা নানান শিল্পসৃষ্টিতে লেগে থাকতেন। সেসবই তাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন কবে গোপনে তৈরি করতেন, এই শিল্পকর্মগুলি বন্দীদের সংগ্রামী মনোভাবের এবং অন্তবের দৃঢতার বিশ্বস্ত সাক্ষী। এদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বন্দীদের শিল্পপ্রীতি এবং বীরত্বের। এমন কি ফ্যাসিস্টদের জন্য তৈরি শিল্পকর্মগুলিও প্রামণ করে যে, "হীনতম; অমানবিক নির্যাতনের মধ্যেও বন্দীদের সুন্দর শিল্প সৃষ্টির মানসিকতাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় নি। এস এস বন্দীদের বাধ্য করে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের জন্য শিল্পসৃষ্টি করতে। বন্দীরাও লেগে যান কাজে। ফলে কিন্তু এস এস-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দীদের হাতে আসে নিজেদের গড়ে তোলার এক সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বন্দীরা তাঁদের নিজেদেব শক্তি ও ক্ষমতার উপব বিশ্বাসকে বজায় রেখেছেন, পঙ্গু হতে দেন নি। তাঁদের সৃজনশীল ক্ষমতার সাক্ষী এই শিল্পকর্মগুলিকে এস এস ছিনিয়ে নিত বিনা পারিশ্রমিকে। এগুলি ছিল ফ্যাসিজমের রাজত্বে নিপীড়িত মানুষগুলির উন্নততর সাংস্কৃতিক মানের জীবন্ত প্রমাণ।" (ইলসে শুলৎজ)।

এইসব শিল্পসৃষ্টির পেছনে যে দাসশ্রম, নিজেদেব ভাষায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুখেনওয়াল্ডের দুই বন্দী। এরপর আর কিছু বলার প্রয়োজন হয না। শিবিব কম্যান্ডার কোখ-এর বাড়ি তৈরির সময় তাঁরা বাড়ির ভিতের মধ্যে একটা শিশি পুঁতে দেন। তার ভেতরে একটা কাগজে লিখেছেন : অক্টোবর ১৯৩৭, বুখেনওযাল্ড শিবিরেব বন্দীদের দ্বাবা নির্মিত। তারপরেই তাঁদের ঘোষণা : 'কমপেল্ড বাট নট কনকার্ড'। বুখেনওয়াল্ড বন্দী শিবিরে শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক এবং হস্তশিল্পের পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নানা দেশের বেশ কিছু বিখ্যাত শিল্পী এখানে বন্দী ছিলেন, মাত্র কয়েকজনের নামই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন চেক শিল্পী জোসেফ চ্যাপেক, পোল্যান্ডের ক্যারল কনিএকজনী, ফ্রান্সের পিয়েরে মানিয়া, হল্যান্ডের হেনরি পীক, এবং জার্মানির হ্যাবার্ট স্যান্ডবার্গ। এঁদের পাশে বহু অজানা শিল্পী চেষ্টা করতেন তাঁদের আঁকা ছবি বা স্কেচের মধ্যে অতীতের আনন্দ-স্মৃতিকে ফিরে পেতে। ফুটিয়ে তুলতেন বন্দী-জীবনের বর্তমানের জীবন-যন্ত্রণাকে। ভাষা দিতেন ভবিষ্যতের আশাভরা স্বপ্নকে। এই মানুষগুলির শিল্পতন্ময়তা আর নির্ভীক ত্যাগের কথা লিখেছেন প্রাক্তন ফরাসি বন্দী আগস্ট ফেবিয়ার :

"অনেক সময় এক টুকরো রুটি বা একটা সিগারেটের টুকরোর বদলে পাওয়া যেত কাগজ আর পেন্সিল। এদুটি হাতে থাকলে যখনই সম্ভব হত আমরা ঝাঁপিয়ে পডতাম ছবি আঁকার কাজে, ধরে রাখতাম বন্দী জীবনের বিভিন্ন মুখ আর দৃশ্য। অবশ্য আমাদের এই

সৃষ্টিবাসনা এবং জীবনতৃষ্ণাকে চুরমার করে দিতে এস এস বাহিনীর লোকেরা লেশমাত্র দ্বিধা করত না।... বন্দী শিবিরে অসংখ্য স্কেচ আঁকা হয়। শত শত কমরেডদের ছবি আঁকা হয়েছিল। ফরাসি, জার্মান, সোভিয়েত, পোলিশ, চেক, ইটালিয়ান, তুর্কি ও আরো বহু জাতের মানুষের স্মারক। বেশ কজন পেরেছিলেন এই স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে ঘরে ফিরতে। এর বদলে তাঁরা আমাদের দিতেন হয়ত একটু তামাক বা একটা সিগারেট। কখনো বা বন্ধুত্বের করমর্দন।"

গ্রাফিক বা চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও এস এস বন্দীদের দিয়ে তাদের হুকুম মত ছবি আঁকিয়ে নিত। তাই এক্ষেত্রেও গোপন শিল্পের অর্থ ছিল একটাই—বন্দীদের প্রাণ বিপন্ন করা। তবুও বহু গোপন স্কেচ আর ছবির মধ্যে দিয়ে বন্দীরা প্রকাশ করতেন তাঁদের আসল সত্তা, স্বাধীন শিল্পের প্রতি তাঁদের গাঢ় ভালোবাসা। পাশবিক এবং নিকৃষ্টতম পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মসম্ভ্রম বোধের জীবন্ত সাক্ষী এই শিল্পকর্মগুলি। এলফ্ গাঙ্গ লা হোফের ভাষায় এই ছবিগুলি হল "গতকালের, আজকের এবং আগামী দিনের বিজয়ী মানুষের সংগীত"। এই সত্যিকারের শিল্প এবং তার স্রষ্টাদের অন্তরের অজেয় শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন বুখেনওয়াল্ড বন্দী হ্যারবার্ট গুটে তাঁর প্রখ্যাত 'পার্টিজান—উইদাউট আর্মস' বইয়ে লিখেছেন: "পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের রূপটা কিরকম এ বিষয়ে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে যোগাযোগ হবে এটা বিশ্বাস করতাম। শিবিরের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের মধ্যেও আমরা নিশ্বাস নিতাম। ছেঁড়া মলিন কাপড়ে জড়ানো কঙ্কালের মত শরীরগুলি চলে বেড়াত শিবিরের জলকাদাভরা মেঠো রাস্তা দিয়ে। কোটরে ঢোকা চোখগুলি এক মনে মাটির দিকে তাকিয়ে খুঁজে বেড়াত—একটা কাপড়র টুকরো, একটা ফেলে দেওয়া দড়ি, একটা তুবড়ে যাওয়া টিনের কৌটো, এক টুকরো কাগজ—সবকিছু তুলে নিয়ে জহুরির মতন পরীক্ষা করে দেখা হত কোনো কাজে লাগবে কিনা।"

"ব্যারাকের সামনে পড়ে আছে কয়েকটি মৃতদেহ, নগ্ন। এঁরা গতকাল রাত্রে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন? শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন কথাটা বড্ড বেশি ভক্তি গদগদ শোনাচ্ছে না কি? শীর্ণ, দুর্বল একটি মূর্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসেছ যেন কিছু বলবে, তার বুকের উপর একটা লাল ত্রিকোণ, তার মাঝখানে কালো অক্ষরে বড় হাতের 'এফ' লেখা, অর্থাৎ মূর্তিটি একজন ফরাসি বন্দী, 'কমরেডস, আপনাদের কারো কাছে কি শাদা একটা কাগজের টুকরো আছে?' নেই। আমাদের কাছে কিছুই নেই। মূর্তিটি নিজেকে টানতে টানতে চলতে লাগল, কি করুণ দৃশ্য! হঠাৎ একটা চিন্তা আমাদের মাথায় এল। থমকে দাঁড়িয়ে একই ভাবনা মনে নিয়ে আমরা একে অপরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম—আমাদেরকেও কি ঐরকম দেখতে লাগছে? ঐ রকম করুণ? ক্লান্ত শরীরগুলি আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করল। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চললাম ব্যারাকের দিকে—আমাদের খাঁচায় ঢোকার জন্য··।

"ধীরে ধীরে দরজাটা খুলল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম, দরজার সামনে বেশ ফিটফাট পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে এক মাঝবয়সী লোক। বুকে লাল রঙের কোণ কাটা। অর্থাৎ এস এস-দের ব্যক্তিগত চাকর। অন্ধকার ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'কি ব্যাপার'—বলি আমি।

"দ্বিধাগ্রস্তভাবে আরেকটু এগিয়ে এসে সে বলে, 'আমি বিরক্ত করতে চাই না, তবে যদি কিছু না মনে করেন একটা কথা বলতে চাই।'



"আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে উঠে বসলাম।

"ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ব্লকে বহু ফরাসি সহবন্দী আছেন, তাঁদের একজনের নাম বরিস (সম্ভবত ইনি হচ্ছেন পোলিশজাত ফরাসি চিত্রকার বরিস টাসলিৎজ্‌কী)। সে ছবি আঁকতে বড় ভালবাসে। প্রত্যেকের কাছেই একটুকরো কাগজ চেয়ে বেড়ায়। আমি তাই শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনি কি আমাকে এক টুকরো কাগজ দিতে পারেন ? বরিস বড় ভাল বন্ধু।

"দু-চোখে জিজ্ঞাসা আর মিনতি নিয়ে সে তাকাল আমার দিকে। এই লোকটা সম্ভবত সারাজীবনে নিজের জন্য কখনো ভিক্ষা চায় নি। আমার কাছে তখন কয়েকটা হলুদ হয়ে যাওয়া পুরনো প্যাডের কাগজ ছিল। সেগুলি দিয়ে দিলাম তাকে। একগাল হেসে সে কাগজগুলি তার জ্যাকেটের তলায় লুকিয়ে ফেলল আর সেলাম করার ভঙ্গিতে মাথাটা নুইয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর খুব ধীরে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"বরিস ছবি আঁকতে খুব ভালবাসে। বন্দীশিবিরের এই সান্ত্বনাহীন পরিবেশের মধ্যেও একজন মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে শিল্পের মধ্যে দিয়ে। হয়ত তার ছবিগুলো বিরাট কোনো শিল্পকর্ম নয়, কিন্তু সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা মানুষ

মানুষের মত কিছু করছে, অন্য মানুষের জন্য অনুভব করছে ততক্ষণ সে মানুষই থাকে, 'মুজেলম্যান' হয়ে পড়ে না।"

[কথাটা বন্দী শিবিরে ব্যবহার করা হত একটা বিশেষ অর্থে। 'মুজেলম্যান' হল সে, যে অত্যাচারী নিষ্ঠুরতার কাছে আত্মসমর্পণ করে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।—লেখক]।

বরিস টাসলীৎজ্‌কীর উদাহরণ ছিল ফ্যাসিস্টদের খুনী রাষ্ট্রের জেলখানায় বন্দী বহু ত্যাগী ও সাহসী শিল্পীর প্রতীকস্বরূপ। এঁরা সম্পর্কে আরেক প্রাক্তন বুখেনওয়াল্ড বন্দী ফ্রান্সের রজার আর্নোউল্ড লিখেছেন :

"বুখেনওয়াল্ডে আমরা সবসময় চেষ্টা করতাম নানান সাংস্কৃতিক এবং শিল্পকর্মের সাহায্যে আমাদের নিজেদের নৈতিক বল এবং সংগ্রামী মনোভাব বাড়িয়ে তুলতে। আমাদের মধ্যে ছিলেন কবি, সংগীতজ্ঞ এবং চিত্রকর। এর মধ্যে চিত্রকরদের বিশেষ সমস্যা ছিল ছবি আঁকার সরঞ্জাম যোগাড় করা। সরঞ্জাম বলতে রং, তুলি, স্ক্রীন ইত্যাদির কথা বলছি না। একেবারে গোড়ার জিনিশ—পেন্সিল আর কাগজ যোগাড করাই ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে আমাকে অবশ্যই আমাদের শিল্পী কমরেড বরিস টাসলীৎজ্‌কীর নাম উল্লেখ করতে হবে। বড় চমৎকার ছিল তাঁর কাজ। এস এস অফিসাররা পিস্তলের নিশানা ঠিক রাখার জন্য যে পিচ্‌বোর্ডের চাকতির ওপর গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করত, সেগুলির পিছনে বরিস আঁকতেন তাঁর স্কেচগুলি। শ্যুটিং রেঞ্জে কর্মরত সহবন্দীরা বরিসকে এগুলি যোগান দিতেন।"

বুখেনওয়াল্ড শিবিরে বন্দীরা গ্রাফিক এবং চিত্রাঙ্কনের যেসব নমুনা রেখে গেছেন তা বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন ব্যাপক, তেমনি বহুমুখী তার রূপ। বারবার যা মনকে নাড়া দেয় তা হল ছবিগুলির মধ্যে প্রকাশিত শিল্পীদের একেবারে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা এক শক্তির তেজী চেহারা। ছবিগুলি দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের সেই দিনগুলি। সস্নেহে এবং সযত্নে আঁকা পেন্সিল স্কেচগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা অনুভব করি শিল্পীদের পরিবার পরিজন এবং মাতৃভূমির সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা। বর্বর ও অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্পীদের অভিযোগ আর প্রতিবাদের স্বর যেন আমরা শুনতে পাই কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে। সুন্দর এক ভবিষ্যৎ এবং আশার কথা বলে জল রঙে আঁকা ছবিগুলি। আমাদের কানে ভেসে আসে শিল্পীদের সেই বিষাদ-মলিন স্মৃতির কোমল সুর, মানুষের স্বাধীনতা আর সম্ভ্রমবোধের জন্যে তাঁদের বলিষ্ঠ আহ্বানে মন যেন আনন্দে সাড়া দিয়ে ওঠে। নির্দ্বিধায় অনুসরণ করি তাঁদের সুদীর্ঘ সংগ্রামের সংকেতকে। নানান ধরনের শিল্পকর্ম আমরা হাতে পেয়েছি—জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ড, কারুকার্য করা ছবি, ছেঁড়া কাগজের ওপর স্কেচ থেকে শুরু করে চেক বন্দী জোসেফ পিরবুলা এবং পোলিশ কমরেড কাজিমিয়ার টিমস্কীর পরিকল্পনার এটের্সবার্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের উপর আঁকা ছবির অ্যালবাম। এই ভয়ঙ্কর সময়ের উপরে প্রাক্তন ডাচ বন্দী গোভার্ট রীটমীস্টার এক রিপোর্টে লিখেছেন :

"বুখেনওয়াল্ডে হেনরি পীক নামে আমার এক বন্ধু ছিলেন। এখানেই তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয় আমি পাই। ড্রইং পেন্সিল দিয়ে হেনরি ভারি চমৎকার আঁকতে পারতেন। ছবিগুলির মধ্যে ধরা আছে বন্দীজীবনের চরম দুর্দশা ও যন্ত্রণার নানান স্মৃতি। আর আছে অসংখ্য শীর্ণকায়, লাঞ্ছিত, নিজ পরিবার থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া কমরেডদের স্মৃতি। যখনই আমি এই ছবিগুলির দিকে তাকাই তখনই আমার সারা শরীরে ঘৃণা আর আতঙ্কের এক কাঁপন ধরে। আজ যাঁরা আমাদের কাছে আসেন তাঁদের এই স্মৃতিগুলি এক বিশেষ শিক্ষা দেয়। তাঁরা এগুলি দেখে বুঝতে পারেন যুদ্ধ কী ভয়ঙ্কর এবং

অর্থহীন। তাবা শেখেন যে যে কোনো দেশ বা জাতি শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপেব মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র নিজেব বিকাশেব বাস্তা খুঁজে পায়।"

চিত্রাঙ্কন এবং গ্রাফিকেব প্রশস্ত প্রয়োগক্ষেত্রেব বিববণ দিয়ে প্রাক্তন বুখেনওয়াল্ড বন্দী হাইনজ ব্রাউন্স বলেছেন

যাবতীয় সন্ত্রাস প্রয়োগ করেও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেব অধিকাংশ বন্দীব মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেব প্রতি আগ্রহ খতম কবা যায় নি।" ডাচ শিল্পী কমবেড হেনবি



পীককে বাধ্য করা হয়েছিল দীর্ঘ সময় ধরে কম্যান্ডার কোখের জন্য ছবি আঁকতে। তা সত্ত্বেও তিনি সহবন্দীদের অনুরোধে নানা ছবি আঁকতেন। যেমন একবার আমার স্ত্রীকে জন্মদিনে উপহার দেবার জন্যে আমি তাঁকে একটা ছবি এঁকে দিতে অনুরোধ করি। একটুকরো কাঠকয়লা দিয়ে তিনি আমাকে ছবিটি এঁকে দেন। সহবন্দীদের সহায়তায় ছবিটি শিবির থেকে গোপনে পাচার করা হয়। সেটা এখনো আমার কাছে আছে।

"কোনো কমরেডের জন্মদিন থাকলে চেষ্টা করা হত তাকে আনন্দের, অন্তত একটা ছোট্ট



রসদ দেবার। সকালবেলায় তাকে শুভেচ্ছা সংগীত শোনানো হত এবং শেষে দেওয়া হত নিজেদের আঁকা একটা শুভেচ্ছা কার্ড। এই উপহারগুলি প্রত্যেককেই বারেবারে অভিভূত করত। আমার নিজের কাছেই একটা এই ধরনের শুভেচ্ছা কার্ড আছে। এটি আমাকে আমাদের সোভিয়েত কমরেডরা উপহার দেন।

"বুখেনওয়াল্ডে খুন হওয়া শ্রমিক নেতাদের সম্মানার্থেও শিল্পকে কাজে লাগানো হত। যেমন, এর্নস্ট থেলম্যানের স্মৃতির উদ্দেশে একটি গোপন স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁর একটি ছবিও আঁকা হয়। মডেল হিশেবে কাজ করে পুরনো খবরের কাগজে ছাপা একটি ছবি। এটি লাইব্রেরি থেকে যোগাড় করা হয়। এর কিছুদিন পর মারা যান এলবার্ট ফেজার (ইনি ছিলেন জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির রাইখস্ট্যাগ প্রতিনিধি। মারা যান ১৮ অক্টোবর, ১৯৪৪, বুখেনওয়াল্ড)। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশেও একটি গোপন সভা করা হয়। আমি আর ব্রুনো আপিৎজ লুকিয়ে তাঁর মৃতদেহটির কাছে যাই। ফেজারের মৃত মুখের একটা ছাঁচ ব্রুনো তৈরি করে নেয় (মৃত্যু মুখোশ)…।

"বুখেনওয়াল্ড বন্দীদের মনে সুন্দরের প্রতি কামনা যে নিঃশেষ করে দেওয়া যায় নি তারই প্রমাণ হল তাঁদের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ যা তাঁদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের নির্ভরযোগ্য সাক্ষী।" বুখেনওয়াল্ড শিবিরে চিত্রাঙ্কন এবং গ্রাফিকে নানান পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করা হত। এ সম্পর্কে প্রাক্তন চেক বন্দী আনটোনিন ওয়াইজার লিখেছেন :

"সংগ্রামী শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বুখেনওয়াল্ডে চিত্রকরেরা একটি বিশেষ আসন দখল করেন, এঁদের মধ্যে সবার আগে বলতে হবে জোসেফ চ্যাপেক-এর নাম…। প্যারিস-এর লেবরুক্স-এর নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক টুকরো রুটির বদলে সে আনন্দের সঙ্গে চেক ব্লকে কাজ করত। কখনো সে আঁকত শিবির জীবনের পুরো জীবনচক্রটি। কখনো বা তাকে আঁকতে অনুপ্রেরণা জাগাত কোনো এক বিশেষ বন্দীর বিশেষ কোনো অবস্থা। তাছাড়া অনেক সহবন্দীর পোর্ট্রেটও সে এঁকে দিত। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধ শেষে শিবির খালি করার প্রস্তুতির সময় তার অধিকাংশ ছবিগুলিই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

"এ ছাড়াও ছবি আঁকতেন নানান জাতির বন্দী চিত্রকরেরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শখের শিল্পী। এঁরা বহু পোর্ট্রেট এবং শিবিরজীবনের নানান দৃশ্য আঁকতেন। দারুণ জনপ্রিয় ছিল ক্যারিকেচার বা কার্টুন শিল্প। শিবিরের এই ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে কার্টুনের কথা শুনলে প্রথমে অবিশ্বাস্য ঠেকবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, শিবিরের এই অসংখ্য মানুষের জন্যে সব জিনিশেরই অভাব এত তীব্র ছিল যে, তাকে এক কার্টুনে ছাড়া অন্যভাবে প্রকাশ করার কোনো রাস্তা ছিল না। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ফ্যাসিবাদ তার নিকৃষ্টতম চেহারাটাই দেখাত। সমস্তরকম মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, অধিকারবোধ, যা কিছু তিলমাত্র মানবিক, তাকে বিসর্জন দিয়ে ফ্যাসিস্ট এস এস তাদের আদিম রূপ এখানে প্রকাশ করত। আর এই সত্যকেই প্রকাশ করত শিল্পীদের কার্টুনগুলি। স্বাভাবিকভাবেই একজন স্বাধীন মানুষের আঁকা কার্টুনছবির চেয়ে বন্দীদের এই ছবিগুলি ছিল ভিন্নস্বাদের। বিকৃত এক জগতে শুধু এগুলিই ছিল প্রায় অবিকৃত।"

বুখেনওলাল্ডের স্যাটায়ার শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন স্বনামধন্য হ্যারবার্ট স্যান্ডবার্গ। তাঁর অর্থপূর্ণ ছবিগুলিতে একসপ্রেশনিজম-এর ছাপ ছিল স্পষ্ট। এই বুখেনওয়াল্ডেই তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির একটি। এটি ছিল বিভিন্ন স্কেচ এবং ক্যারিকেচারের এক অ্যালবাম বিশেষ। পরে এগুলি এক সঙ্গে 'একটি বন্ধুত্ব' নামে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়।

চারু ও কারু শিল্পের উপর এই পরিচ্ছেদের শেষে আমরা হ্যারবার্ট স্যান্ডবার্গকেই শেষ

কথা বলতে দিই। ফ্যাসিস্টদের মৃত্যু শিবিরে শিল্পকার্যে রত ছিলেন এমন অসংখ্য সহবন্দীর হয়েই যেন তিনি বলেছেন :

"বন্দীজীবনের স্মৃতির কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। বন্দী হয়ে থাকাটা কোনো সাফল্য ছিল না—বরং বাইরে থাকলে কাজে লাগতাম। তাছাড়া প্রায় দশ বছরের বন্দীজীবন কাটিয়ে টিকে থাকার কৃতিত্বের খুব কম অংশই আমার নিজের। 'কি করে জ্যান্ত অবস্থায় মুক্তি পেলেন ?'—বারবার এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। জবাবটা তারাই বুঝবে যারা শ্রমিক সংগ্রামের চেহারাটা চেনে। কেবল তারাই বুঝবে যারা বহু ব্যবহৃত সংহতি শব্দটির মানে জানে। বন্দীজীবনের প্রথম দিনটি থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আমার দেহ ও মনে গেঁথে ছিল এই শব্দগুলির সার। সমমনোভাবাপন্নদের সঙ্গে পার্থিব এবং মানসিক ঐক্যই আমাকে খাড়া করে রাখে। এর ফলেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কঠিনতম কাজগুলির চাপ সহ্য করা। প্রায়ই অসুস্থতার মধ্যে পেতাম সহবন্দীদের সেবা, অনাহারের যন্ত্রণার মধ্যে পেতাম এক কণা রুটি আর অসহ্য ঠাণ্ডার দিনে পেতাম এক টুকরো অন্তর্বাস। এটাই ছিল অনেক, এটাই ছিল আধখানা জীবন। কিন্তু সেই কাঁটাতার আর অত্যাচারের বেড়ার মধ্যে এটা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র আমাদের সকলের ঐ ভ্রাতৃত্ববোধের ঐক্যের ফলে…।



"তবে আমরা জানতাম, আমাদের জীবনে একটা আদর্শ আছে। আমরা জানতাম কেন আমরা বন্দী হয়েছি। আর ঐ আদর্শটা বন্দীজীবনের মধ্যেও আঁকড়ে ধরে প্রতিদিন চেষ্টা করতাম তাকে নতুন করে পেতে। যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা বহু লড়াইয়ের পর নিজস্ব লাইব্রেরি সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছি। আমরা নিজেদরে জন্যে বই আনতে পারতাম। ব্যবহারের পর এগুলি শিবিরের লাইব্রেরিতে চালান হত। সম্ভাব্য সকল পথে প্রথমে বৈধ এবং পরে গোপনে নিষিদ্ধ উপায়ে খবরের কাগজ এবং নানান সংবাদ শিবিরে পাচার করা হত।

"খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ। প্রতিবেশী প্রায় সব রাষ্ট্র থেকে নতুন নতুন বন্দীরা আসায় এটা আরো জমে উঠত। এর মধ্যে অনেকেই ছিলেন

বুদ্ধিজীবী। আমাদের সংহতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। আসলে মানসিকভাবে দীন হচ্ছে সে-ই, যার সামনে কোনো সত্যিকারের কাজ থাকে না। যার গোটা দিনটাই শূন্যতায় ভরা। আর আমাদের সামনে ছিল একটা বিরাট কাজ ; স্যাবোতাজ-এর সাহায্যে ফ্যাসিস্টদের খুনী ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব ব্যাহত করা, হাজার হাজার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্তকে স্যাবোতাজ করা, আর যেখানেই সম্ভব সেখানে সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে ফ্যাসিবিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া।

"আমাদের কাজের এটাই ছিল বিষয়বস্তু এবং অর্থ। ১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এ সময়ে আমাকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে হত। অসুস্থতার জন্যে কয়েকটি দিন ছুটি পাই। এই স্বল্প সময়ে আমি আমার 'একটি বন্ধুত্ব'-র ১৮টি পাতা আঁকি স্টোভের কালি আর গ্রাউন্ড চক দিয়ে। আমার একজন রাজনৈতিক বন্ধু ছিলেন যাঁকে মাঝেমধ্যে কাজের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হত। ছবিগুলি তিনি গোপনে এরফুর্টে পাচার করে দেন। মুক্তি পাওয়ার পর আমি সেগুলি ফেরত নিয়ে আসি।

"আমার প্রায় এক দশকের বন্দীজীবনে এগুলিই ছিল আমার একমাত্র উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। কারাজীবনের গোড়ার দিকে নিজের মনোরঞ্জনের জন্যে এবং বন্ধুদের অনুরোধে আমি বেশ কিছু ক্যারিকেচার বা কার্টুন আঁকতাম। বুখেনওয়াল্ডেও আমি এ ধরনের কাজে লেগে যাই।

"আজ আমার কাজের অনেকগুলিই সফল শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত। অবশ্যই এর কারণ হচ্ছে এগুলির সৃষ্টি আমার হৃদয়ের অনুভূতি থেকে। কিন্তু তাছাড়াও এগুলি আর একটা জিনিশ প্রমাণ করে। ঐ সময়ে ঐ পরিস্থিতিতেও বন্দীরা তাঁদের লড়াই ও প্রতিরোধ চালিয়ে গেছেন। আর সমগ্র সময়ের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে সুখকর ছিল সেই সময়টা যখন আমি শিবিরে আমার শেষ ছবিটি আঁকি—১৯৪৪-এর এপ্রিলে—নতুন দিনের সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন দুজন যোদ্ধা। ঠিক এক বছর পর ছবিটি আমাদের জীবনে সত্যে পরিণত হয়।"



২

সংগীত

"স্বাধীনতা এবং মানুষের প্রগতির ক্ষেত্রে সংগীত তথা যন্ত্রশিল্পের অবদান কী ? এ সম্পর্কে একটি কাল্পনিক রিপোর্টের পাতা ওলটালে এক ঝলকে চোখের সামনে ভেসে উঠবে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। নানা ধরনের সংগীত—মার্চিং সং, হিম্‌ন্‌, কনসার্ট থেকে শুরু করে সিমফোনি ছিল আমাদের আশ্রয় ও হাতিয়ার। এর মধ্যে দিয়ে জাগিয়ে

রাখা হত এক সংগ্রামী চেতনা—যে চেতনা ফ্যাসিবাদের মানবতাবিরোধী শাসন প্রতিরোধে শক্তি যোগাত এবং লড়াইকে করে তুলত অর্থবহ ও কার্যকরী। এই লড়াই থেকেই জন্ম নিত প্রতিরোধ। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। প্রতিরোধকারীদের প্রায়ই এগিয়ে যেতে হত মৃত্যুর মুখে। মৃত্যু যাঁরা এড়াতে পারতেন, সেই সৌভাগ্যবানদের খুব হালকা শাস্তিও ছিল লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, নির্বাসন, সলিটারি সেল···আমরা জানি, বহু শিল্পীকেই এই পথে যেতে হয়। আমাদের চোখের সামনেই ঘটে এসব—শুধু শিল্পের জন্যে, শুধু সংগীতের জন্যে কী নির্মম শাস্তি তাঁদের সহ্য করতে হয়। কিন্তু তার ফল কী ঘটে ? এই শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে সক্রিয় সংগ্রামী হয়ে ওঠেন, শ্রমিক শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়ান। যাবতীয় জাতীর স্বার্থের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দাঁড়ান এঁরা। এঁদের লড়াই হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও গণমৈত্রীর সপক্ষে সংগ্রাম। এর মধ্যেই আছে প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রকৃত বীরত্ব। এটাই আমাদের সময়ের মহাকাব্য—এই হল সমস্ত উত্তরসূরীর জন্যে রেখে যাওয়া সেরা টেস্টামেন্ট।"

—গুনথার ক্রাফট।

গণহত্যার জন্যে গড়ে তোলা আর পাঁচটা শিবিরের মত বুখেনওয়াল্ড বন্দীশিবিরেও বন্দীদের সাংস্কৃতিক জীবনে সংগীতের এক বিশেষ স্থান ছিল। এস এস বাহিনী নিজেদের স্বার্থে ও তাদের অবসর বিনোদনের জন্যে বন্দীদের বাধ্য করত গান ও বাজনা তৈরি করতে। তার অধিকাংশই ছিল জাতিবিদ্বেষী সংগীত ও গদগদ দেশভক্তিমূলক ব্যাপার। তবু এই বাধ্যতামূলক কাজ বন্দীদের সংগীতচর্চার সুযোগ এনে দিত। আইনসম্মত এই সুযোগের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর তাঁদের আসল কাজ করতেন। এইভাবেই তাঁরা একদিকে সাংগীতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও চর্চা করতেন, অন্যদিকে সৃষ্টি করতেন নতুন নতুন ফ্যাসিবিরোধী সংগীত। এই কাজে তাঁরা ব্যান্ড এবং অর্কেস্ট্রা, স্ট্রিং কোয়ার্টেট এবং কোরাস—সবই ব্যবহার করতেন। এইভাবেই বন্দী সংগীতশিল্পীরা সহবন্দীদের সাহায্য করতেন, তাঁদের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামী মনোভাবকে রক্ষা করতে, দৃঢ়তর করতে সহায়তা করতেন। এটা বড় কম কাজ নয়। নরকের ওই পরিবেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরের কথা, বাঁচার ইচ্ছাও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। একাজে তাঁরা কতটা সফল হতেন ?

"শিবিরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সংগীতানুষ্ঠানগুলির মধ্যে বন্দীদের জীবনাবস্থার পরিচয় পাওয়া যেত। এখানে যেসব গান গাওয়া হত বা যেসব সুর বাজানো হত তার অনেকগুলিই তখন জার্মানিতে নিষিদ্ধ। এসব সুর শোনাও ছিল বন্দীদের কাছে দারুণ এক উপাদেয় ও অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। বহু বন্দী এর থেকে নতুন করে সাহস ও শক্তি ফিরে পান।

"এইসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতির শিল্পীরা তাঁদের নিজেদের দেশের গান বা নাচ পরিবেশন করতেন। অনুষ্ঠানের আগে পরে সেসবের ব্যাখ্যাও করতেন তাঁরা। ফলে অন্যান্য জাতির বন্দীদের সঙ্গে শিল্পীর একটা মানসিক যোগ গড়ে উঠত এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ হয়ে উঠত প্রশস্ত। বন্দীদের সৃষ্টির মধ্যে একটা দিক বিশেষ করে এবং অনিবার্যভাবেই ফুটে উঠত, তা হল ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব। এই দিকটির মধ্যে যে মস্ত বড় বিপদের ঝুঁকি ছিল তা বলাই বাহুল্য। তবুও অনুষ্ঠানগুলিতে শুধু দেশবিদেশের বিখ্যাত সুরই পরিবেশিত হত না, বন্দীদের নিজেদের লেখা গান ও তাঁদের তৈরি সুরও স্থান পেত নিয়মিত ও সমমর্যাদায়।"

—ক্লাউস ড্রোবিশ।



বন্দীদের বহুমুখী ও সৃজনশীল প্রয়াসের সুস্পষ্ট প্রভাব প্রদর্শনকলার ক্ষেত্রেও দেখা যায় । এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ হয় যা রীতিমত উঁচু মানের । এগুলির জন্ম বুখেনওয়াল্ডে হলেও বুখেনওয়াল্ডেব ভূগোল ও সময়ের মধ্যেই তাদের আবেদন সীমাবদ্ধ থাকে নি । যুদ্ধোত্তব ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনে এগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে । এ বিষয়ে ১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক শিবির কমিটির একটি গোপন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । এই রিপোর্টে বুখেনওয়াল্ডে বিভিন্ন শিল্প-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিকাশ আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । তার অংশবিশেষ এইরকম :

"গোড়ার দিকে বন্দীদের ফ্যাসিবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, প্রধানত, রবিবার দুপুরের অনুষ্ঠানে। এগুলিকে অনুষ্ঠান না বলে জমায়েত বা আড্ডা বলাই হয়ত সঙ্গত। ১৯৩৮ সালে বেশ কয়েকজন নামকরা শিল্পীকে বন্দী করে শিবিরে আনা হয়। তাঁদের উপস্থিতির ফল ফলে দ্রুত। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিশেষ করে ক্যাবারেগুলি খুব সূক্ষ্ম ও উঁচু মানে পৌঁছয়। এঁদের মধ্যে একজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন লোহ্‌নার বেডা। পরবর্তীকালে তাঁকে বুখেনওয়াল্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত বেডাকে পোল্যান্ডের আউশ্‌উইৎজ শিবিরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর স্কেচ ও কবিতা সত্যিই হৃদয় স্পর্শ করে। বহু বন্দীর কাছেই এগুলি ছিল নতুন জীবনীশক্তি ও আনন্দের উৎস।

[তখনকার দিনে লোহ্‌নার বেডার কয়েকটি রচনা সারা ইউরোপে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিল। যেমন, তাঁর জার্মান অপারেটে দ্য ডেলাইটফুল উইডো, ল্যান্ড অফ স্মাইলস ইত্যাদি। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শ্রোতা যখন এগুলি শুনে আনন্দ পাচ্ছেন, আনন্দের স্রষ্টা ঠিক সেই সময়েই ফ্যাসিস্ট শিবিরে বন্দী, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছেন যাবতীয় নির্যাতন, নিপীড়ন আর অবমাননা। জার্মানিতে তখন মানুষ সবই বুঝত কিন্তু মুখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। সবকিছু সত্ত্বেও বেডা কিন্তু একদিনের জন্যেও তাঁর রসবোধ হারান নি। বুখেনওয়াল্ডে রেডিও ছিল, তাতে মাঝে মাঝেই বেডার সুরগুলি বাজত। বাজনা শেষ হয়ে গেলে, প্রতিবার, বেডা উঠে দাঁড়াতেন, বাউ করে বলতেন, 'লেখক আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে'। যেন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সামনে অগণিত শ্রোতা, বাতাসে উন্মাদ করতালিধ্বনি। করুণ ও নির্মম এক পরিস্থিতিতে হাসিমুখ বেডার ব্যঙ্গটুকু সবাইকে স্পর্শ করত।—লেখক]

"১৯৪১ সালে এস এস এক ফন্দী আঁটে। শিবিরের মধ্যে তারা একটা সিনেমা হল তৈরি করায়। সেখানে শুধু নাৎসি প্রচারচিত্র দেখানো হত। এর পেছনে তাদের একটা হিশাব ছিল। তারা ভেবেছিল, বন্দীরা তাদের জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে এবং ক্রমাগত জমে ওঠা প্রবল সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা মেটাতে দলে দলে সিনেমা হলে এসে ভিড় করবে। শুধু তাই নয়, তৃষ্ণা মেটাতে তারা দশ ফেনিগের টিকিটও কিনবে। নাৎসি প্রচারশক্তির ওপর এস এস-এর অগাধ আস্থা। তাদের প্রচারচিত্র বন্দীদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে দেবে, অন্তত প্রতিরোধের অর্থহীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত করবে, এমন একটা ভাবনা মাথায় খেলে থাকবে। কিন্তু ফল হয় ঠিক উলটো। এইসব ফিল্ম দেখানো শুরু হলে বন্দীদের মধ্যে প্রকৃত সংস্কৃতির তৃষ্ণা এবং সেই সংস্কৃতি চর্চার আগ্রহ প্রবলতর হয়ে ওঠে। প্রধানত রাজনৈতিক বন্দীদের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বন্দীদের নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক জগত।

"প্রথমে আমরা তুলনামূলকভাবে শান্ত কম্যান্ডগুলিতে ছোট করে শুরু করি। যেমন প্যাথলজি, হাসপাতাল ও স্টোর কম্যান্ডো। এইসব জায়গায় শুরু হয় ছোট ক্যাবারে বা ওই ধরনের অনুষ্ঠান। এগুলিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম হলেও ক্রমশই অনুষ্ঠানগুলির গুণগত মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এগুলির উৎকর্ষ চরমে ওঠে অল্প কিছুদিন পরেই, যখন রাজনৈতিক বন্দীদের পরিচালনায় একটি অপেরা প্রযোজিত হয়। অপেরাটির নাম, 'বই-এর ঘর বা ওয়ালডেবুর্গে উকুনযুদ্ধ'। এটি পরিবেশিত হয় ১৯৪৩-৪৪ সালের বড়দিনে। আপাতদৃষ্টিতে অপেরাটির বিষয় ছিল উকুনের আক্রমণ—শিবিরের এক প্রাত্যহিক সমস্যা। প্রত্যেক বন্দীর গায়ে ডজন ডজন উকুনের বাস। তাদের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে, আসলে উকুনকে সামনে রেখে ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চমৎকার বক্তব্য উপস্থিত করেন শিল্পীরা।

"শিবিরের অর্কেস্ট্রার উন্নতি ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। বিশেষ বিশেষ সন্ধ্যায় কনসার্ট দেওয়া শুরু হয়। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু। তারপর থেকে কয়েক সপ্তাহ অন্তরই গান ও কনসার্টের আসর বসত বুখেনওয়াল্ডে।

[প্রথম প্রকাশ্য কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের ১ আগস্ট। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলির তারিখ হল ১৯৪৩ সালের ১৫ এবং ২৯ আগস্ট; ১৬, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর; ৯, ২৩ এবং ৩১ অক্টোবর; ১২ এবং ২৪ ডিসেম্বর; এবং ১৯৪৪ সালের ১২ এবং ১৬ জানুয়ারি। এর পরে, অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিক থেকে ক্যাবারে, অপেরা, গানবাজনা, ক্রীড়া প্রদর্শনী, নানা ধরনের শিল্পপ্রদর্শনী ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সংগঠিত করা হয়। —লেখক]।

"...এ পর্যন্ত আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সবাই ছিলেন জার্মান বন্দী। ১৯৪২ এবং বিশেষত ১৯৪৩ সালে বহু বিদেশীকে বুখেনওয়াল্ডে বন্দী করা হয়। এর ফলে শিবিরের ভেতরের অবস্থা বদলে যায়। বিদেশী বন্দীদের অনেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শিল্পী



এবং উদ্যোগী সংগঠক। গোড়ায় এক একটি জাতির বন্দীরা নিজেদের কনসার্ট গ্রুপ তৈরি করেন। [শিবিরের ভাষায় এগুলিকে বলা হত ব্লক কনসার্ট গ্রুপ।— লেখক]। ১৯৪৩ সালের শরৎকাল থেকে ব্লক কনসার্টগ্রুপগুলি নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা উচিত চেক, ফরাসি, সোভিয়েত ও পোলিশ গ্রুপের কথা। এঁরা অত্যন্ত উঁচু মানের কনসার্ট গড়ে তোলেন এবং সুর রচনা করেন।

"১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালে অনুষ্ঠানগুলি নতুন করে প্রযোজিত হয়। এবারে ওই সিনেমা হলে। শিবিরে বিভিন্ন জাতির বন্দীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গড়া হয়। এর একটা পটভূমি ও উদ্দেশ্য ছিল। ততদিনে এই অনুষ্ঠানগুলি একটা ভিত্তি পেয়ে গেছে। রাজনৈতিক বন্দীরা উপলব্ধি করেন যে, অনুষ্ঠানগুলিকে একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সে আদর্শের মূল মন্ত্র হবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকতাবাদী সংগ্রাম। এই উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন। এর মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন ও সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপার ত ছিলই। [এই আন্তর্জাতিক কমিটি গড়ে ওঠার পর ১৯৪৪ সালের ৩০ জানুয়ারি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯ মার্চ, ৯ এবং ১৬ এপ্রিল, ৩০ জুলাই, ১৭ আগস্ট, ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখে শিবিরে প্রকাশ্য কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।—লেখক]।

"সিনেমা হলের অনুষ্ঠানগুলিতে একটা অসুবিধা হত। সেখানে বন্দীরা নিজেদের মধ্যে তেমন আলাপ আলোচনা চালাতে পারতেন না। এস এস-এর লোক সেখানে যখন তখন এসে হাজির হত। তাদের চররাও ঘুরঘুর করত চারপাশে। তা সত্ত্বেও বন্দীরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে জমিয়ে আড্ডা মারতেন। তবু অসুবিধা ত ছিলই, কথাবার্তা বলতে হত বুঝেসুঝে, মেপেজুকে। এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্যে বন্দীরা একটা ফন্দি করেন। ফন্দি না বলে তাকে শিল্পও বলা যায়। ভাষাশিল্প। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাবার জন্যে তাঁরা একটা অদ্ভুত সাংকেতিক ভাষা বের করে ফেলেন। সেই ভাষাতেই চলত তাঁদের আলাপ আলোচনা, এবং আড্ডাও। শুধু তাঁরাই বুঝতেন সে ভাষা, এস এস বা তার চরদের সাধ্য কি সে ভাষায় দাঁত ফোটায়!

"আন্তর্জাতিক শিবির কমিটির কাজ শুধু কনসার্টের আয়োজন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা ছিল তার প্রকাশ্য কাজ। কিছু কাজ তাকে করতে হত গোপনে। সেই গোপন কাজের একটি ছিল শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া। এইটেই ছিল আসল কাজ, বন্দীদের মন থেকে হতাশা কাটিয়ে বেঁচে থাকার ও সংগ্রাম করে যাওয়ার শক্তি যোগানোর কাজ। খুবই বিপজ্জনক কাজ। এই কাজকে আড়াল করার জন্যে নানা জাতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। তার অনেকগুলিই ছিল শুধুই গানবাজনা বা থিয়েটার, নিছক বিনোদনের ব্যাপার। এর আড়ালে যে অনুষ্ঠান হত, তার দরজা সবার জন্যে খোলা ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য। গোপনতা, কঠোর গোপনতাই বুখেনওয়াল্ডের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বাঁচার প্রধান মন্ত্র। এইসব অনুষ্ঠানের খবর তাই জানানো হত শুধুমাত্র বাছাই করা বন্দীদের, ছোট এক সুশৃঙ্খল গোষ্ঠীকে। এই গোপন অনুষ্ঠানের উদাহরণ হিশাবে একটি নাটকের কথা বলা যায়। অন্যান্য জাতির সহবন্দীদের জন্যে এই রাজনৈতিক নাটকটি প্রযোজনা করেন সোভিয়েত বন্দীশিল্পীরা। আবার খুব সফল একটি প্রমোদ অনুষ্ঠানে কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। নানা জাতির বন্দীরা মিলে অভিনয় করেন শেকস্পীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', বলা বাহুল্য, প্রকাশ্যেই।

"আন্তর্জাতিক কমিটির তদারকিতে অনুষ্ঠিত গানবাজনার আসরের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতির ব্লক গ্রুপগুলি একক বা যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। যেমন

ফরাসি ও সোভিয়েত এবং চেক ও পোলিশ গ্রুপ যৌথভাবে কনসার্ট, গান, থিয়েটার বা অপারেটের পরিবেশন করে। দুই দেশের বন্দীরাই উপস্থিত থাকেন দর্শকের সারিতে। এই সাংস্কৃতিক সহযোগিতা যত বাড়ে ততই অনুষ্ঠানের গুণগত মান ও রাজনৈতিক সচেতনতা উন্নত হতে থাকে। ক্রমশই জোর পড়তে থাকে রাজনৈতিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক একতার ওপর।

"এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ফরাসি ব্লকের বন্দীদের কথা। এঁদের কাজকর্ম ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিবিরে রচিত সেরা গান, সেরা সাহিত্য ও সেরা নাটকেব জন্যে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। বন্দীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। এঁরা একবার একটি শিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। বুখেনওয়াল্ডে তৈরি শিল্পকর্মগুলি সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়। এক দুপুরে তাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন—সে অনুষ্ঠান মানবিকতার মহত্ত্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানটি ছিল শিবিরের সবচেয়ে উপেক্ষিত ও বিপন্ন-প্রাণ শিশুবন্দীদের জন্যে, তাদের নিয়েই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের মিষ্টি ও কেক দিতে ভোলেন নি 'সলিডারিটি ফ্রাসে'-র কমরেডরা।·· কোথা থেকে আর কেমন করে যে সেসব সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁরাই জানেন। শিশুদের অনেকেই জীবনে সেই প্রথম কেক খেল, একটু বড়রা খেল বহুদিন পরে!"

১৯৪৪ সাল। ইঙ্গ-মার্কিন বোমারু বিমান ক্রমশ বেশি বেশি করে হানা দিচ্ছে খোদ জার্মানিতে। তেমনি এক হানায় বোমা পড়ল বুখেনওয়াল্ড বন্দীশিবিরে। জনাকয়েক বন্দীর প্রাণ গেল। তাঁদের উদ্দেশ্যে এক স্মৃতিসভার আয়োজন করেন বন্দীরা। এর কয়েকদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক কমিটি এক ঘোর সংকটের মধ্যে পড়ে। শিবির কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেয়। তাঁদের মধ্যে পড়ে যান আন্তর্জাতিক কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য। ফলে কমিটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। অন্য দিকে বিপদের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তখন বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সুরেব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আক্ষরিক অর্থেই রাতারাতি সেসব অনুষ্ঠানসূচি পালটে দিয়ে 'নির্দোষ' প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বন্দীরা। সাংস্কৃতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণকারী বন্দীদের রাজনৈতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধের ফলেই এটা করা সম্ভব হয়। এর ফলে বহু বন্দী গেস্টোপোর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রেহাই পান, অনেকেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান।

ফরাসি বন্দীদের পরেই যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন পোলিশ যুবগোষ্ঠী। শিবিরের আংশিক ইভ্যাকুয়েশনের সময় এঁদের কোথায় যে চালান করে দেওয়া হয়! তার আগে পর্যন্ত এঁরা ভারি সুন্দর ও প্রেরণাদায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

শিবিরের শেষ দিন পর্যন্ত চেম্বার মিউজিক কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। গোড়ার দিকে যারা ছিল নিতান্তই অ্যামেচার সেই অনিপুণ শিল্পীরাই শেষপর্যন্ত দুটি অসাধারণ উঁচু মানের কনসার্ট সৃষ্টি করেন। অসম্ভব সাফল্যের সঙ্গে তা পরিবেশিতও হয়।

এইসব কাজকর্মের কথা স্মরণ করতে গিয়ে শিবিরের প্রাক্তন জার্মান বন্দী রবার্ট জিওয়ার্ট লিখেছেন :

"গোপন আন্তর্জাতিক কমিটির প্রভাবে ও পরিচালনায় সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ক্রমশ প্রাণবন্ত ও বেগবান হয়ে ওঠে। এইসব কাজের একটা বড় লক্ষ্য ছিল, যারা সাহস ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে তাদের জোর যোগানো এবং বন্দীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর করা। দুটি

লক্ষ্য পূরণেই বন্দীরা যে বহুল পরিমাণে সফল হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাফল্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠত কোনো কোনো অনুষ্ঠানে, বিশেষত, কোনো কোনো অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ অংশে। এইসব অংশে শত্রু যেন চিহ্নিত হয়ে যেত অনায়াসে, নানা কৌশলের আড়াল সত্ত্বেও। স্পষ্ট হয়ে যেত বন্দীদের গোপন করে রাখা মন ও প্রতিজ্ঞা। এবং তখন মঞ্চের ওপরে যারা, তাঁদের সঙ্গে একাকার হয়ে যেত মঞ্চের নীচে বসে থাকা দর্শকের দল।

"একবার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটির নাম 'মুর ফৌজের গান'। আমরা, অভিনেতারা, মঞ্চে এসে দাঁড়ালাম। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বেলচা। শুরু হল মুর ফৌজের গান। গাইতে গাইতে এল শেষ লাইনটি : 'তারপর, তারপর আর মুর সৈন্যরা বেলচা হাতে জলাভূমিতে কাজে নামল না, নামল না।' লাইনটি আমরা গেয়ে উঠলাম আবেগ দিয়ে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। 'না' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মঞ্চের ওপর ঠুকতে থাকলাম হাতের বেলচা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনটি আমরা গাইতে থাকলাম বারবার, গলা ছেড়ে, বুক চিতিয়ে। হঠাৎ কোথাও একটা কিছু ঘটে গেল। আমাদের সঙ্গে গেয়ে উঠল দর্শকরাও, সমস্ত দর্শক। লাইনটা মুহূর্তে যেন একটা প্রতীক হয়ে উঠল। একটা বিশ্বাস যেন মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠল, আমাদের হারানো যাবে না, আমরা হার মানব না, আমরা জিতবই, শেষপর্যন্ত আমরাই জিতব।"

রবার্ট জিওয়ার্ট আরো লিখেছেন :

"মঞ্চের একেবার সামনে, প্রথম সারিতে বসে থাকত এস এস-এর মাতব্বররা। মাঝে মাঝে তারাও এইসব উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে নিজেদের মুখোশ বজায় রাখতে পারত না। একটি নাটিকার একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। নাটিকাটির নাম 'পাথরভাঙা', বুখেনওয়াল্ডের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা।... চারজন বন্দী পাথর ভাঙছেন। পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন সুপারভাইজার। তিনি মাঝেমাঝেই বন্দীদের তাড়া দিচ্ছেন আরো দ্রুত কাজ করতে। মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আজকের কাজের কোটা যেমন করে হোক পূরণ করতেই হবে। বন্দীদের 'ক্যাপো' রেগে টং হয়ে আছে। কাজের কোটা পূর্ণ হয় নি বলে গতকালই তাকে পঁচিশ ঘা বেত খেতে হয়েছে। সুপারভাইজারের তাগাদা শেষ হয়েছে কি হয় নি, মঞ্চে ক্যাপোর আবির্ভাব। কাজের বহর দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। দারুণ খেপে সে গালিগালাজ করতে শুরু করে। চেঁচিয়ে ওঠে, 'সব ব্যাটা কুঁড়ে আর বদমাশ : সবকটাকে আজ বসের কাছে রিপোর্ট করে দেব, তখন বাছাধনরা বুঝবে কত বেতে কত মধু!'

"সুপারভাইজার ক্যাপোকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে। বলে, 'বেচারাদের হাল ত দেখতেই পাচ্ছ। প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কে জানে, এর আগে হয়ত কখনো এদের কায়িক শ্রম করতে হয় নি। এখন চেষ্টা করছে। যতটা পারে করছে।...এদের একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না, এরা কে কোন পেশার লোক?'

"ক্যাপোটির একেবারেই ইচ্ছে নেই। কথা বলা মানে সময় নষ্ট, কোটা নষ্ট। তার মানেই আবার চাবুকের ঘা। অথচ সুপারভাইজারকে ত চটানো যায় না। অতএব...একজন বন্দীর কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করে, 'তোমার আসল পেশা কি, হে?' বন্দীটি উত্তর দেয়, 'আজ্ঞে, আমি প্যারিস অপেরার প্রথম টেনর'। দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করে ক্যাপো। সে বলে, 'আজ্ঞে, আমি ওয়ারশ অপেরার প্রথম টেনর'। তৃতীয়জনকে জিজ্ঞেস করতে তার জবাব, 'আজ্ঞে, আমি প্রাগ অপেরার প্রথম টেনর।' 'বটে, তোমরা সব গায়ক! তা তোমাকে ত বোধহয় জিজ্ঞেস করার দরকার নেই?' চতুর্থজনের দিকে তাকিয়ে বলে ক্যাপো। সে লাফ দিয়ে ওঠে। নিজের গায়ের ছেঁড়া ওভারকোটটা খুলে ফেলে। মেফিস্টোর পোশাকে দাঁড়িয়ে



সে বলে, 'আমি বুদাপেস্ট অপেরার প্রধান গায়ক'।

"সুপারভাইজারের নির্দেশে ক্যাপো এরপর বন্দীদের প্রত্যেককে তাদের আপন পেশায় দক্ষতার নমুনা দেখানোর আদেশ দেয়। তখন আমরা, যারা সেই সন্ধ্যায় বুখেনওয়াল্ডের সিনেমা হলে জড়ো হয়েছিলাম, শুনতে পেলাম ওয়ারশ অপেরার টেনর রুডলফ-এর গলায় পুকিনিস-এর গান, লা বোহেমে। প্যারিস অপেরার ডন জোজে গেয়ে উঠল বিৎজেট-এর কারমেইন-এর একটি অংশ। প্রাগের হান্স শোনাল দ্যা ব্রাইড হু ওয়াজ সৌলড-এর অপূর্ব একটি গান। সব শেষে গুনড-এর মার্গারেটে থেকে মেফিস্টোর গান গেয়ে উঠল ছোটখাট চেহারার ইহুদি বন্ধুটি। গানের শেষে গোটা হল ফেটে পড়ল হাততালিতে। এবার সুপারভাইজারটি ক্যাপোর দিকে ফিরে বলল, 'দেখলে ত, এরা পাথরভাঙায় তেমন দড় নয় বটে, হয়ত অন্য অনেক কাজই এদের দিয়ে হবে না, কিন্তু এরা যদি মাঝেসাঝে এরকম সুন্দর গান গেয়ে শোনায় তা হলে হযত আমাদের জীবন আরেকটু মধুর হতে পারে। পারে নাকি ?' তার ডায়লগ শেষ হতেই গোটা হল ফেটে পড়ে হর্ষধ্বনিতে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যেত প্রথম সারি এস এস মাতব্বরদের কেউ কেউ-ও যোগ দিয়ে ফেলেছে তাতে, হয়ত বেখেয়ালেই।

"বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়ে বন্দীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, তর্কাতর্কি চলে। এমন কি তথাকথিত 'সবুজ'দের মধ্যে যারা তখনও মনুষ্যত্বের সবটুকু হারায় নি, তারাও ভিড়ে যায় আমাদের দলে।" ['সবুজ'রা ছিল পেশাদার অপরাধী। তাদের পোশাকে আঁকা থাকত সবুজ ত্রিকোণ, রাজনৈতিক বন্দীদের পোশাকে লাল ত্রিকোণ। এস এস প্রায়ই সবুজদের দিয়ে মারপিট করাত রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর। তারা এস এস-এর গুপ্তচরের কাজও করত। —লেখক]।

প্রকাশ্য কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আড়ালে অন্য এক সংস্কৃতির চর্চা চলত সমানেই। আর চলত গোপন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। এই কাজ করতে গিয়ে বন্দীরা একই সঙ্গে অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্যে অসম্ভব ঝুঁকি নিতে হয়েছে তাঁদের, মাঝেমাঝেই তাঁদের অনেকের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু যে যার কাজ করে গেছেন। কখনো কখনো তাঁরা এস এস-এর সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনা ও মূর্খতাকে কাজে লাগাতেন নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে। এইভাবে সংগীতের প্রকৃত ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে ও তার চর্চা চালিয়ে যেতে সক্ষম হন বুখেনওয়াল্ডের হতভাগ্যের দল। প্রায়ই তাঁরা তখনকার জার্মানিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কোনো সুর বা গান পরিবেশন করতেন, অন্য নাম দিয়ে। বিশেষত স্লাভিক সুরগুলির ক্ষেত্রে এই কৌশল নিতেন তাঁরা। এস এস-এর লোকজনকে বোঝানো হত, এগুলি একেবারে খাঁটি 'আর্য সংগীত'। তাই বুঝে তারাও খুব বাহবা দিত গানের পর। শিবিরে তৈরি সুর নিয়েও এমনি কৌশলের খেলা খেলতে হত বন্দীদের। এতে খানিকটা সুবিধাও হত। এইভাবেই শিবিরে রচিত একটি গান, 'মুক্তির লড়াইয়ে আহ্বান' অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বুখেনওয়াল্ডের বন্দীদের কাছে এইসব অনুষ্ঠান ছিল অমূল্য, তাঁদের মানসিক জোরের উৎস। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের রেখাটি যে বন্দীর কাছে ক্রমশ বিলীয়মান, হতাশার সেই অন্ধকারে বেঁচে থাকার কোনো কারণই যিনি আর খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁর কাছে এক একটি গান, এক একটি কনসার্ট বা নাটকের অভিজ্ঞতা যেন নবজন্মের মত।

তাঁদের সাংস্কৃতিক কাজকর্মের কথা ভাবতে গিয়ে মনে রাখতে হবে, সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বুখেনওয়াল্ডে দানা বেঁধে ওঠে যুদ্ধের শেষের দিকে। গোড়ার দিকে এসব ছিল প্রায় অসম্ভব। রাজনৈতিক বন্দীরা যেসব অনুষ্ঠান পরিবেশন করতেন তার

কোনো কোনোটির মান রীতিমত উঁচুদরের। তখনকার ইওরোপে বন্দীশিবিরের বাইরে তেমন অনুষ্ঠান করাই সম্ভব ছিল না। আর হিটলারের সাম্রাজ্যে কোথাও এ ধরনের ভাল জাতের ও আন্তর্জাতিক বোধে উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ত ছিল অকল্পনীয়, এমন কিছু করার চেষ্টাও তখন প্রায় আত্মহত্যার শামিল।

এই কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষ্ঠান যে বন্দীদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা, তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও জয়ের বাসনাকে বাঁচিয়ে রাখত, তাকে অদম্য করে তুলত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে বন্দীদের পারস্পরিক সহযোগিতার যে মনোভাব প্রকাশ পায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি তাকে আরো সংহত করে তোলে।

এই সংহতিবোধ বারেবারে বুখেনওয়াল্ডে প্রকাশিত হয়েছে, নানা ঘটনায়। অন্য জাতির কমরেডের জন্যে প্রাণ বিপন্ন করেছেন বহু বন্দী, তবু তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছেন। দুর্লভ রুটির টুকরো নিজে না খেয়ে তুলে দিয়েছেন অন্যের মুখে। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন সহবন্দীকে। এমনও ঘটেছে, সহবন্দীকে সাহায্য কর্‌বার জন্যে কঠোর পাহারা উপেক্ষা করে চুরি করে এনেছেন খাবার বা ওষুধ অথবা পোশাক। হাসো গ্রাবনার-এর লেখা একটি কবিতায় বুখেনওয়াল্ডের ভয়ংকর পরিবেশ ও সেই পরিবেশেও গড়ে ওঠা বন্দীদের সংহতিবোধের চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। গ্রাবনার কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'খাদ্যবিতরণ' হয়ত 'কমারাদারি' নামটাই উপযুক্ত হত।

"প্রতিদিন তারা খাবার আনতে যায়/ কাঁটাতারের পাশে/ বাঁ দিকে এক কমরেড, ডানদিকে আর একজন/ তৃতীয়জন মাঝখানে,/ প্রতিদিন।/ দুজন আর্জি করে রোজই/ সুপটা যেন খুব কম না হয়,/ খাসা সুপ।/ সে নীরবে থাকে/ যেন তার কিছুতেই কিছু যায় আসে না।/ সুপটা আর কিছুই নয়/ বাঁধাকপির পাতা সেদ্ধ,/ একটা রান্নাই হয় এখানে।/ যখন তারা পেছন ফেরে,/ ফিরে যেতে,/ তিনজোড়া হাতে তিনটি বাটি,/ অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে/ সে তার হাড়গুলোকে টেনে নিয়ে চলে/ বাটিটা কিন্তু শক্ত করে ধরা/ যেন ঘোড়ার লাগাম।/ সুপটা তার কাছে ভারিও নয়, গরম নয়,/ কোনো বিকার নেই তার/ ঢালার সময় বুড়ো আঙুলের ওপর পড়লেও/ গরম সুপ/ তার মুখ দিয়ে রা বেরোয় না,/ যেন অনুভূতিহীন।/ লোকটা হয়ত ঢালাইমিস্তিরি/ যার সয়ে গেছে সবই/ কিছু চেষ্টায়, কিছু সময়ে,/ গরম সওয়াও,/ এরকম কিছু ভাবা যেতে পারে।/ তা নয়/ তার ভাবলেশহীন মন/ সে অর্জন করেছে অন্যভাবে।/ কয়েক পক্ষ আগে/ আমরা দুজন শুনলাম/ তৃতীয়জন বলছে,/ 'আমি মারা যাব'।/ আমরা মাথা নাড়লাম।/ এ বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত/ জনপদে বা অরণ্যে/ এ আচরণ আনাড়ির মতো,/ নির্মম, অসভ্যতাই।/ বুখেনওয়াল্ড ত জনপদ নয়,/ অরণ্য নয়,/ মৃত্যু এখানে সান্ত্বনা।/ এখানে মৃত্যুর পথে দাঁড়ায় না কেউ/ জানে, যে যাচ্ছে/ সে যাচ্ছে এক স্বাধীন, শান্তির জগতে/ যেখানে বুখেনওয়াল্ড নেই।/ এখানে তার পাওয়ার আর কী আছে?/ সবাই জানে/ সবাই সেখানে যাবে/ আজ বা কাল, এখান থেকে।/ আমরা শুধুই মাথা নাড়ি/ গলায় শব্দ নেই/ কাজের জন্যে কণ্ঠনালীরও ত দরকার/ কিছু খাবার,/ কোথায় যে তা মেলে!/ তৃতীয়জন বলে যায়,/ 'মৃতদের শরীর শক্ত হয়ে যায়/ কিন্তু কাঁচের মত চোখের বিশ্রাম নেই।/ কমরেডস, দয়া করো/ আমার চোখের পাতা বন্ধ করে দিও'।/ আমাদের চোখ নেমে যায় মাটিতে/ মাথা নিচু হয়ে যায়, আপনিই।/ 'তাই হবে',/ তৃতীয় কণ্ঠস্বর তখনও বলছে,/ 'কিছু মনে করো না,/ সুপের বাটিটা কিন্তু আমার হাতে দিও,/ যতক্ষণ গরম থাকবে/ ধরে থাকব, চেপে,/ বুড়ো আঙুলটা বাটির ওপরে/ অন্যগুলো নীচে।/ আমার হাতদুটো তুলে ধর/ যাতে না কাঁপে,/ এমনি করে...'/ তারপর থেমে, একটু দম নিয়ে যেন,/ দৃশ্যটি সে দেখায়/ কেমন করে সুপের বাটি



নিয়ে যেতে হয়,/ তার জীবনের প্রথম থিয়েটার ।/ 'ব্যারাকের ওই কোণে, অন্ধকারে/ আমাকে শুইয়ে রেখো ।/ ভয় পেও না/ এই ঠাণ্ডায় দিব্যি টিকব ।/ সুপের ঘণ্টা বাজলে/ আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও,/ দেখো, পড়ে না যাই ।/ একজন বলবে, গলাটা ভারি করে,/ তিনজনের খাবার দাও !/ এইভাবে প্রতিদিন/ তোমাদের জন্যে আমি/ খানিকটা সুপ আনতে পারব ।'/ এইসব কথা বলতে বলতে/ তার দুচোখে ঝাপসা উন্মাদনা/ ঝলমলে এক খুশির আলো,/ অন্যরা জানে না কী করে ব্যথা গিলবে,/ ব্যথা ত সুপ নয় ।/ তারা ভাবছে মৃত্যু বড় তাড়াহুড়ো করছে/ যা সে বলছে তা বড় ভয়ংকর/ বাঁধাকপির সুপে নিত্য আতংকের ছায়া ।/ কিন্তু সে দিয়ে যেতে চায়/ তার শেষ পোশাকের চেয়েও বেশি/ তার কমরেডদের জন্যে ।/ মাথাটা পেছনে হেলে পড়ে/ তার আগেই সে বলে ওঠে,/ 'পোল্যান্ডকে প্রণাম ।' তারপর সব শেষ/ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত/ হওয়ার কথা ।/ তারপরেও দিন যায় ।/ প্রতিদিন কাঁটাতারের পাশে/ কাঁটার খোঁচার সাথে/ বাঁ দিকে এক কমরেড/ ডানদিকে আর একজন/ তৃতীয়জন তাদের একলা থাকতে দেয় না ।"

নিপীড়িত, লাঞ্ছিত এই মানুষগুলির কাছে গান ও সুরের আকর্ষণ আর মূল্য যে কী ছিল, সংগীত তাঁদের অন্তরে যে কী শক্তি যোগাত তা বর্ণনা করা কঠিন । প্রাক্তন ডাচ বন্দী গেরিট ফন ডেনব্যার্গ লিখেছেন :

"মাঝেমাঝেই আমরা শুনতে পেতাম মোর জুডো এবং বাউড-এর পিয়ানো কনসার্ট । সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা । মজাটা এই, গোটা ইউরোপে—হিটলারের ইউরোপের—এঁদের বাজনা তখন নিষিদ্ধ, আর আমরা বুখেনওয়াল্ডে বসে শুনছি । আর কোথাও এ সুর শোনার

উপায় নেই, শোনা যায় শুধু বুখেনওয়াল্ডে। তখন জুলাই মাস, গ্রীষ্মকাল, একটি সন্ধ্যার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। জনাকয়েক বন্দী স্থির করলেন, একটা কনসার্ট দেবেন। শীর্ণ, জীর্ণ দেহগুলি কোনোক্রমে একটি পিয়ানো টেনে টেনে আনল, ছত্রিশ ও একচল্লিশ নম্বর ব্লকের মাঝখানের রাস্তায়। তখন সন্ধ্যা নামছে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি সবে শেষ হয়েছে। পথের ওপর একটা পিয়ানো দেখে অনেকেই থমকে দাঁড়ালেন। পিয়ানো থেকে ভেসে গেল প্রথম সুর। চারিদিক থেকে বন্দীরা এসে নীরবে দাঁড়ালেন চারপাশে। বাতাসে তখন মৃত্যুর নীরবতা। এঁদের অনেকেই বহুদিন আসল সুর শোনেন নি। পিয়ানো থেকে ভেসে আসছে প্রকৃত সংগীত, যা ক্রমাগত উঁচুতে ওঠে এবং সঙ্গে করে উর্ধ্বে নিয়ে যায় শ্রোতাদের। গোটা শিবির তন্ময় হয়ে শোনে। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে এস এস-এর কিছু লোকও, নীরবে। তাদের মুখের গালিগালাজ থেমে গেছে। ওয়াচটাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরাও শুনছে কান পেতে।

ছত্রিশ নম্বর ব্লকের জানলাগুলি ভরে যায় কৃশ, মৌন অথচ উজ্জ্বল মুখে, পোলিশ বন্দীদের মুখ। সেই মুখগুলির দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়, তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁদের ভেতরটা। অভূতপূর্ব, যেন অনাস্বাদিতপূর্ব এক সংগীতের অলৌকিক আকর্ষণশক্তি। বন্দীদের আচ্ছন্ন করছে, তাঁরা ভুলে গেছেন আর সব। সুরের ভেতর দিয়ে জীবনের স্পর্শ পেয়ে মৃতপ্রায় সেই মানুষগুলোর চোখ যেন অন্ধকারেও চকচক করছে।"

আগেই বলা হয়েছে এইসব কনসার্টে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে চেম্বার মিউজিকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বুখেনওয়াল্ডের প্রাক্তন চেক বন্দী ভলাস্তিমিল লউডা এর উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন :

"এস এস তাদের জানোয়ারের মত আবরণ আড়াল করার জন্যে এমন একটা ভাব দেখাত যেন বন্দীদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা স্বাদ দিতে তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। অন্যান্য কিছু বন্দীশিবিরের মত বুখেনওয়াল্ডেও তারা চেম্বার মিউজিকের আয়োজন করার অনুমতি দেয়। তারা প্রচার চালায়, এতে বন্দীদের একঘেয়ে জীবনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাবে। কিন্তু তাদের আসল মতলব বেশিদিন আড়ালে থাকে না, দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ চেম্বার মিউজিক গ্রুপের সদস্যদের ঠিক অন্য বন্দীদের মতই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হত। পরবর্তীকালে এস এস বিভিন্ন বন্দীশিবিরে বন্দীদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র যোগাড় করার অনুমতি দেয়, যাতে তারা সপ্তাহে অন্তত দুদিন রেওয়াজ করতে পারে। তবে এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় নি যে, নিজেদের বর্বরতার ওপরে একটা পরদা ঢাকা দেওয়ার জন্যেই এস এস এসব করছে।

"১৯৩৮ সালে শিবিরের প্রধান প্রশাসক রোএড্ল্-এর আদেশে চেম্বার মিউজিক গ্রুপ তৈরি করা হয়। প্রথমে দু-একজন শিল্পী গীটার নিয়ে শুরু করে। পরে ধীরে ধীরে ট্রামপেট, অ্যাকর্ডিয়ন, ড্রাম ইত্যাদি যোগাড় হয়। সবই যোগাড় করতে হয় বন্দীদের, এস এস একবিন্দুও সাহায্য করে নি। বরং উলটোটাই করেছে। চেম্বার মিউজিক গ্রুপ যাতে রেওয়াজ করতে না পারে সেই জন্যে গ্রুপের সদস্যদের তারা বেছে বেছে সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে শ্রমসাধ্য কাজে পাঠাত। যেমন, তাঁদের যেতে হত কাঠের গুদামে কাজ করতে বা রাজমিস্ত্রীর কাজে।

"সে সময় চেম্বার মিউজিক গ্রুপের অবস্থা ছিল অনেকটা ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের মত। জিপসিদের মত এর শিল্পীরা যখন তাঁদের সুর বাজাতেন তখন তাঁদের সামনে দিয়ে মারতে মারতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত রক্তাক্ত, শীর্ণ, পরিশ্রান্ত বন্দীদের। সেই বন্দীদের কমরেডরা তখন সুর বাজাচ্ছেন। সংগীত শুনছেন। সব মিলিয়ে এমন এক নির্মম, অমানবিক দৃশ্য

তৈরি হত যা লিখে বর্ণনা করা অসম্ভব। এখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝেই জিপসিদের হুকুম করা হত দ্রুত তালের মজার গান গাইতে এবং বাজনা বাজাতে এবং ঠিক তাঁদের সামনে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের উলঙ্গ করে পঁচিশ কি তারও বেশি চাবুকের ঘা লাগাত এস এস-এর পশুরা। যেন চাবুক মারার তালের জন্যেই সুর বাজানো।

"প্রায় সব বন্দীশিবিরেই ফ্যাসিস্টরা অসহায় বন্দীদের শাস্তি দেওয়ার অস্ত্র হিশাবে গানবাজনাকে ব্যবহার করত। জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে বন্দীদের বাধ্য করা হত প্রকাশ্য রাস্তায় জার্মান প্রশস্তি গীত গাইতে। এস এস চাবুক হাতে তদারক করত। যারা ঠিকমত গাইতে পারত না তাদের শরীরে আছড়ে পড়ত চাবুক। শুধু একবার গাইলেই হত না। ক্ষুধার্ত, দুর্বল, শীর্ণ শরীরের মানুষগুলিকে প্রচণ্ড শীতে, প্রায় বস্ত্রহীন অবস্থায়, পথে বা মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বাধ্য করা হত দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা ধরে গান গাইতে, হিটলার ও জার্মানির গুণগান। এইভাবে বন্দীশিবিরে চরম উপহাস করা হত মনুষ্যত্বের আর সংগীতের। সংগীত, যা আসলে মানুষের অন্তরের আনন্দ ও বেদনাময় অনুভূতির রূপময় প্রকাশ, তা ফ্যাসিস্টদের হাতে পড়ে পেত বিকৃত এক কদর্য চেহারা।

"এস এস-এর সাহায্য ও উৎসাহদানের একটা নমুনা দেওয়া যাক। ১৯৪০ সালে শিবিরকর্তা হাউফ্‌ট্‌স্টোর্মফুয়েরার ফ্লোরস্টেড একটা উইন্ডইনস্ট্রুমেন্ট বাদক দল গড়ার আদেশ দেয়। শিবিরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ বন্দী বুসের সঙ্গে কথা বলার সময় সে প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রয়োজনীয় খরচাপাতি শিবির কর্তৃপক্ষই দেবে। ১৯৪০ সালেই প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হয় এবং পরের বছর গোড়ার দিকে সেসব চলে আসে। দাম পড়ে সাড়ে পাঁচ হাজার রাইখ্‌স্ মার্ক। বিল পেয়ে ফ্লোরস্টেড সোজা বলে দেয়, শিবির কর্তৃপক্ষ এক পয়সাও দেবে না, দাম মেটাবে ইহুদিরা। [এ ধরনের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। একবার অর্কেস্ট্রা শিল্পীরা তাঁদের যন্ত্রপাতির জন্যে কিছু তার কেনার অনুমতি চান। অনুমতি দেওয়া হয়। তার আসে তিরিশ মার্কের। বন্দীদের দিতে হয় দু-হাজার মার্ক।—লেখক] ইহুদিরা ছিলেন শিবিরের 'দুগ্ধবতী গাভী', এ ধরনের অত্যাচার আর শোষণ তাঁদের কপালে প্রায়ই জুটত। তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অন্যান্য বন্দীরা। নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে বিল মেটালেন তাঁরা। বিল মিটল, কিন্তু দুর্ভোগের তখনো কিছু বাকি। বাদ্যযন্ত্রগুলি শিবিরে পৌঁছলে এস এস প্রধানের আদেশে তাদের নিজস্ব নিজস্ব চেম্বার মাস্টার বেছে বেছে বারটি সেরা যন্ত্র সরিয়ে নেয়। এগুলি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে এস এস আত্মসাৎ করে। (১৯৪৫ সালের ১১ এপ্রিল, শিবিরমুক্তির চোদ্দদিন পরে, আমি এগুলি পুনরুদ্ধার করি এবং আমাদের চেম্বার মিউজিক হলে ফিরিয়ে আনি)। বাকি বাদ্যযন্ত্রগুলি বন্দীরা হাতে পান।

"গোড়ার দিকে ষোল জন সদস্য নিয়ে চেম্বার মিউজিক গ্রুপ তৈরি হয়। সপ্তাহে দু-দিন রেওয়াজ করার সুযোগ পাওয়া যেত। এ ছাড়া দু-দিন সকালে বাজাতে হত মার্চিং টিউন।

"অল্পদিন পরেই অনুশীলনের সময়ও এস এস ব্লক ফুয়েরাররা এসে তাদের হুকুমদারি চালাতে আরম্ভ করে, বিকৃত রুচির হুকুমদারি। কখনো গ্রুপের সদস্যদের একই গানের সুর পনের ষোলবারও বাজাতে হত, তাদের আদেশে। কখনো আবার পঁচিশ থেকে তিরিশটি মার্চিং টিউন বাজাতে হত। একনাগাড়ে। গানের মাঝখানে বিশ্রামের সময় তাদের আদেশে কমিয়ে দিতে হয়। দুটি গানের মাঝখানে শিল্পীরা বিশ্রাম পেতেন ঠিক এক মিনিট। ফলে, এটা একটুও বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তথাকথিত হালকা শাস্তির ব্লকে ছ-জন সদস্য ফুসফুসের দুর্বলতায় ও যক্ষ্মা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দল থেকে বাদ যান। একজন ত টিবি-তে মারাই যান।

"১৯৪৩ সালে আমার ওপর চেম্বার মিউজিক গ্রুপের দায়িত্ব পড়ে। প্রথম থেকে আমার

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটাই ; যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব সহবন্দীকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনকাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। অনেক চেষ্টার পর চেম্বার গ্রুপের সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় বত্রিশ। এ ছাড়া বেশ কিছু কমরেডকে আনুষঙ্গিক বাজনা বাজাবার জন্যে নিয়ে আসা হয়।

"সব মিলিয়ে কখনো কখনো চুরাশিজন পর্যন্ত সহবন্দীকে নিয়েও অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হই আমরা। বিভিন্ন জাতির কমরেড ছিলেন এঁদের মধ্যে। এঁরা সাময়িকভাবে হলেও যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদনকাজ থেকে অব্যাহতি পান। এছাড়াও 'কনসার্টে'র একটা আলাদা ভূমিকা ছিল। কথাবার্তা সরাসরি বা খোলাখুলি বলার সুযোগ হলেও কনসার্টের আড়ালে আমাদের সাংকেতিক ভাষায় আমরা পরস্পরেব প্রতি সংহতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারতাম। সবসময় আমরা চেষ্টা করতাম যাতে সহবন্দীরা আত্মবিশ্বাস অটুট রেখে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারেন, দেখেন।"

প্রায়ই অর্কেস্ট্রাকে ফ্যাসিস্টরা যেভাবে কাজে লাগাত তা থেকেই তাদের রুচিবিকৃতির পরিচয় পাওয়া যেত। চূড়ান্ত অপব্যবহার হত অর্কেস্ট্রার। এবং চরম অবমাননা করত ইহুদি বন্দীদের। অর্কেস্ট্রার সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইহুদি বন্দীদের তারা বাধ্য করত নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে। বন্দীদের আত্মসম্ভ্রমের একেবারে শেষটুকুও দু-পায়ে মাড়িয়ে সুখ পেতে চাইত এস এস-এর পশুরা। এ সম্পর্কে প্রাক্তন বুখেনওয়াল্ড বন্দী অস্ট্রিয়ার জুলিয়াস ফ্রয়েন্ড লিখেছেন :

"এক রবিবারের কথা। বিকেল চারটে। রোলকল শেষ হয়েছে। ক্যাম্পের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেম্বার মিউজিক শুরু হল। শিল্পীরা চমৎকার বাজাচ্ছেন ভিয়েনা-সুর। স্বভাবতই আমরা, অস্ট্রিয়রা, খুব খুশি হয়ে হাততালি দিতে থাকি। কিন্তু বন্দীরা আনন্দ পাচ্ছে এমন দৃশ্য কি বরদাস্ত করতে পারে এস এস-এর ফ্যাসিস্ট মেজাজ ? তারা একদল ইহুদি বন্দীকে জড়ো করে ফেলল। তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে গেল রোলকল-এর জায়গায়। সামনে একজন এস এস গ্রুপলিডার, তার পেছনে একদল ক্যাপো, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বেত। বন্দীদের সংখ্যা প্রায় তিনশ। সবাই ইহুদি। এবার অর্কেস্ট্রা গ্রুপকে হুকুম করা হল, ভিয়েনা ওয়ালৎস বাজাও ! বাজনা শুরু হতেই হুংকার করে ক্যাপোদের নির্দেশ দেওয়া হল, সুরের তালে তাল মিলিয়ে বেত চালাও ! বেত চলল। শীর্ণ দেহ, অভুক্ত-প্রায়, রুগ্ন বন্দীরা বেতের আঘাতে টলতে থাকে। অনেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বসে পড়ে। তাদের ওপর হুকুম হল, নাচো ! ওয়ালৎসের সুরের সঙ্গে নাচো, বসে বা আধাবসা হয়েই নাচো। গড়িয়ে পড়লে চলবে না, নাচতে হবে। ক্লান্ত, অপমানিত, বিধ্বস্ত মানুষগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেই বেত, বেতের পর বেত, যতক্ষণ না আবার উঠে বসে এবং নাচতে থাকে।

"দৃশ্যটি এমনই কুৎসিত, বর্বর ও কদাকার যে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের মনে হল শিবিরে কি সবাই উন্মাদ হয়ে গেছে। এখানেই শেষ নয়। আরো কিছু বন্দীকে ধরে আনা হল। বাজনার তালে তাল মিলিয়ে তাদের ওপর চলল চাবুক। এবার এস এস নিজেই চালায়। অসহ্য যন্ত্রণায় বন্দীরা আর্তনাদ করে ওঠেন এবং সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে, সেই আর্তনাদের মধ্যে ইহুদি বন্দীদের নেচে যেতে হয় ভিয়েনা ওয়াল্ৎস-এর সঙ্গে। বাজনা, আর্তনাদ, নাচের আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে যায় হাসি, ফ্যাসিস্ট হাসি।"

কিন্তু বর্বরতা ব্যর্থই হত। ফ্যাসিস্টদের এই পশুর মত আচরণ ও অত্যাচার বন্দীদের গুঁড়িয়ে দিতে ত পারতই না বরং তাদের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হত। ওদের অত্যাচার তাঁদের আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ করত, যেমন করে হোক আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম বজায় রাখতেই হবে।

তারই প্রকাশ ঘটত তাঁদের শিল্পকর্মে। শিল্পকর্ম একাধারে তাঁদের আশ্রয় ও আত্মপ্রকাশ। শত বাধা ও পীড়নও এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত করতে পারত না তাঁদের। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্লক কনসার্ট বা সংগীতবিহীন নানা অনুষ্ঠান ছিল এই প্রচেষ্টার ফল।

এই প্রসঙ্গে গোপন সোভিয়েত সেন্টারের নানান সাংস্কৃতিক কাজকর্মের কথা উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে দুই সোভিয়েত বন্দী বরিস নাসিরোভ এবং ভ্যালেরি চেইফেক বর্ণনা দিয়েছেন :

"ফ্যাসিবিরোধী গোপন লড়াই ছিল খুবই কঠিন। এ লড়াই-এ একদল বন্দী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের আগে এঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পের নানা কাজ করতেন। বন্দীদের মনে নৈতিক সাহস যোগাবার জন্যে এঁরা নানা ধরনের কনসার্ট ও নাটক পরিবেশন করতেন।

"সোভিয়েত সেন্টারের নির্দেশে মিখাইল লেভসেনকফ, সেরগেই কোতভ, স্তেফান বার্ডনিকফ এবং সার্কাসশিল্পী গফটম্যান ওরফে নিকিফোরভ নানারকম গান বাজনা, অ্যাক্রোবেটিক ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। গোড়ায় এঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল সোভিয়েত ব্লকে। ক্রমে অন্যান্য ব্লকেও ছড়িয়ে পড়ে।

"একবার ব্রেড্‌জুট্‌সকোফ নামে এক কমরেড চেকভেব স্মৃতির উদ্দেশ্যে কয়েকটি বক্তৃতা ও ছোট নাটক লেখেন। এগুলি দারুণ জনপ্রিয় হয়। বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'শাপাইয়েভের নাতিরা'। এতে সোভিয়েতের লাল ফৌজের বীরত্বের কথা বলা হয়। এটি



অনুষ্ঠিত হতে থাকে প্রায়ই। আর এক বন্দী শিল্পী ভ্যালেন্টিন ইয়ারমাকোভিচ এটির জন্যে একটি ছবি এঁকে ফেলেন। নাটক অভিনয়ের সময় ছবিটি টাঙিয়ে দেওয়া হত মঞ্চের পেছন দিকে। ওই ছিল মঞ্চসজ্জা। ছবিতে দেখা যায়, একটা মেশিনগানের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শাপাইয়েভ। এই পটভূমিকাতেই প্রযোজিত হয় গোটা অনুষ্ঠানটা।

"এই লেখকই আমাদের উপহার দেন 'নেক্রাসভ্' এবং 'নিকিতিন'-এর দুটি কম্পোজিশন। এই কাজ দুটিতে ছিল আমাদের দেশ ও প্রকৃতির হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা। এ দুটি কাজ বন্দীদের প্রভূত আনন্দ দেয় এবং তাঁদের যথেষ্ট সাহস ও মনোবল যোগায়।

"নানা রকম খেলা দেখাতেন আমাদের সার্কাসশিল্পী নিকোলাই ইভানভ এবং ছোট্ট সাসা। তাঁদেব খেলায় ভরা থাকত কল্পনা আর ট্রিক্স্। সাসা ছিল ডাকনাম, তার আসল নামটা আজ পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। এদের খেলাগুলি শুধু যে আনন্দ দিত তাই নয়, স্যাটায়ারে ভরা এই প্রদর্শনীগুলি থেকে শেখারও ছিল অনেক কিছু।

"একটি বিশেষ কনসার্ট অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। সোভিয়েত ফৌজের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এটির আয়োজন করা হয় মেকানিক্যাল লন্ড্রির বিরাট বাড়িতে লম্বা লম্বা টেবিল জড়ো করে তৈরি করা হয় মঞ্চ। এস এস-এর বিছানার চাদর, যা এই লন্ড্রিতে কাচতে দেওয়া হত, জুড়ে জুড়ে, সেলাই করে তৈরি হয় শাদামাটা স্ক্রীন। সে স্ক্রীনের ওপর ছবিও আঁকা হয়।

"বিভিন্ন ব্যারাকে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়। একটি ব্যারাকে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীরা রেওয়াজ শুরু করলেন কোরাসের, বিখ্যাত সব সুরকারদের গান। আর এক ব্যারাকে নাচের মহড়া দিতে শুরু করলেন আইভান আশারিন এবং আইভান প্লিশচেংকো। নাচে ত শরীর আর শক্তি ক্ষয় হয়। এঁদের সহবন্দীরা সেকথা ভোলেন নি। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকে সহবন্দীরা নিজেদের যৎসামান্য খাবারের বরাদ্দ পুরোটা খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তা থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে তাঁরা খাওয়াতে লাগলেন এঁদের দু-জনকে। এঁরা আপত্তি জানালে সহবন্দীদের সহজ জবাব, অন্তত অনুষ্ঠানে দিন ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

"আশ্চর্য বিস্ময়ের মত আসে কিছু সহবন্দীর উপহার যা না জুটলে এ অনুষ্ঠান কানা হয়েই থাকত। এঁরা কাজ করতেন পোশাক সেন্টারে। খুঁজেপেতে তাঁরা সোভিয়েত ফৌজের কয়েকটি ইউনিফর্ম যোগাড় করে ফেলেন। ১৯৪১-৪২ সালে লালফৌজের যাঁরা বন্দী হন তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া পোশাক।

"কনসার্টে সবাই অংশ নিতে চান। তাঁদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এত হয়ে যায় যে সবাইকে লন্ড্রিতে জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। সোভিয়েত বন্ধুরা অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, প্রত্যেক ব্যারাকের গোপনে জাতীয় কমিটির হাতে আমন্ত্রণের কার্ড তুলে দেওয়া হবে। কমিটিই বিলি করার ব্যবস্থা করবে। যাঁরা কার্ড বিলি করবেন তাঁদের এবং যেখানে অনুষ্ঠান হবে সেখানকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সোভিয়েত সেন্টারের অনেক বন্ধুকে নির্দেশ দেওয়া হল।

"তাঁরা চমৎকার সংগঠন গড়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ যদি এস এস-এর লোকজন এসে পড়ে খবরটা দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে শিবিরে যাতে সবকিছু সামলে নিতে পারেন কমরেডরা।

"কার্ড বিলি করা হয়ে গেলে সমস্ত কোরাস গায়ককে এবং নাচের গ্রুপের সদস্যদের সোভিয়েত ফৌজের পোশাক দেওয়া হল...

"'প্রেক্ষাগৃহ' পবিপূর্ণ। শিল্পীরা যে যার জায়গায়। শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পবদা গেল সরে। দর্শকরা দেখলেন, মঞ্চের ওপর সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একদল সোভিয়েত ফৌজ, গর্বিত তাঁদেব ভঙ্গি, যেন কেউ বন্দী নন, সকলেই বীর। মুহূর্তে হাততালির আওয়াজে ঝনঝন করে উঠল লন্ড্রির জানলার কাঁচ। হাততালি থামতেই গমগম করে উঠল বাতাস, গোটা হল জুড়ে ছড়িয়ে পডল সুর, 'ওট ক্রইযা,' ডো ক্রাইযা', ড্রেশিনস্কি-র অপেরা 'শান্ত ডন'-এব অপূর্ব একটি গান। দর্শকদেব মধ্যে ছিলেন নানা জাতির মানুষ, ফরাসি, জার্মান, চেক, পোলিশ, ডাচ এবং আবো কত! সম্ভবত, তাঁরা গানেব একটি কথাও বুঝতে পারছিলেন না। তবু তাঁদের উজ্জ্বল মুখ আর চকচকে চোখ স্পষ্ট কবে দিচ্ছিল তাঁদেব আনন্দ, বুঝিযে দিচ্ছিল কী উৎসাহেব সঙ্গে তাঁরা উপভোগ করছেন প্রতিটি দৃশ্য।

"তুমুল হর্ষধ্বনিব মধ্যে কোরাস শেষ হল। কোবাসের মূল গায়ক জ্যাকব গফটম্যানের নাম ধ্বনিত হল বারবাব। তারপর দর্শকদের অনুরোধে 'কালিন্‌কা'-র মেলডিব সুরে বেশ কয়েকটি নাচ পরিবেশন কবলেন নৃত্যশিল্পীরা।

"তারপব এল আমার পালা। আমি ঘোষণা কবলাম, মাযাকোভস্কি থেকে পড়ে শোনাব। ঘোষণাটি আমি ফবাসি ও জার্মান ভাষাতেও কবলাম। দর্শকদেব মুখে কী অসম্ভব উৎসাহ আর উল্লাস ফুটে উঠল।

"কবিতাগুলি পড়তে পডতে চোখের সামনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যেতে দেখলাম। দেখলাম, কবিতাব লাইন বাতাসে ভেসে তাঁদেব কাছে পৌঁছতেই চবম অত্যাচাবিত, চূড়ান্ত লাঞ্ছিত, ডোবাকাটা পোশাকপরা মানুষগুলি উসখুস করছেন, যেন যন্ত্রণায় ছটফট কবছেন। তাঁদের ভেতর থেকে অবদমিত মনুষ্যত্ব যেন তীক্ষ্ণ হুংকাবে বেরিযে আসতে চাইছে। চোখগুলো ক্রমশ সার্থকতাব ছোঁযায় উজ্জ্বলতর হযে উঠছে। কবিতার লাইনগুলি সব হযত তাঁরা বুঝতে পাবছিলেন না, কিন্তু একথা আর গোপন থাকছিল না যে তাঁরা একটা বিশেষ কিছু অনুভব করছেন। মায়াকোভস্কি-ব ডাক তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন। দেখতে দেখতে তাঁদেব মাথা উঁচু হয়ে উঠল, যেন আকাশ ছোঁবে, তাঁদেব বুক শক্ত হযে এগিযে এল সামনে, যেন ইস্পাতে তৈরি। কবিতাব প্রতিটি লাইন তাঁবা উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁদের চোখমুখ নীরবে কিন্তু যেন আকাশবিদারী ঘোষণার বলতে থাকল, মাথা নোয়াব না, লডব, বাঁচব!... এতসব যে ঘটল তার কারণ ভ্লাদিমিব মায়াকোভস্কি।

"এবপব সোলোভিয়েভ তাঁব নিজের লেখা কবিতা পডলেন। সাহিত্যেব বিচাবে এগুলি হয়ত তেমন পূর্ণ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু সেই সময, ওই জাযগায়, ওই পবিস্থিতিতে কবিতাগুলি ছিল বিশেষ। চেতনায় ও অনুভূতিতে ধনী, সংগ্রামের জন্যে তাঁর দৃঢ ও সাহসী ঘোষণা আমাদের, বন্দীদেব কাছে ছিল অমূল্য।

"দু-ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এই কনসার্ট। অন্তত, ওই সময়টুকুর জন্যে বন্দীরা ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁরা মৃত্যুশিবিরে বন্দী, প্রতিদিন এখানে খুন হন শত শত মানুষ, এখানে মৃত্যু তাঁদের ঘিরে আছে প্রতিনিয়ত, যে কোনো মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে তাঁদের যে-কারো জীবন। সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষরা ওই আড়াই ঘণ্টার কথা মনে বাখবেন সারা জীবন।"

এ ধরনের কনসার্ট বন্দীদের জীবনে মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করত। তাঁদের বেঁচে থাকতে, টিকে থাকতে সাহায্য করত। হতাশার চরম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি আবার আশায় বুক ভরে আগামী দিনের মুক্তির স্বপ্ন দেখার পথ খুঁজে পেতেন।

বিভিন্ন ব্লকে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির আরো একটি বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্য ছিল। তা হল গণমৈত্রী। এ সম্পর্কে যুগোস্লাভিয়ার এক প্রাক্তন বুখেনওয়াল্ড বন্দীর কথা:

"বিভিন্ন ব্লকের অনুষ্ঠানগুলিতে লোকনৃত্য ও লোকগীতি পরিবেশন করা হত। আনন্দ দেওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটা ত ছিলই, তা ছাড়াও এর মধ্যে শিক্ষণীয় একটি দিক ছিল। এগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ পেতাম। নাচ, গান, হাস্যকৌতুক আর স্যাটায়ারে ভরা এই অনুষ্ঠানগুলি আরো একটা কাজ করত। আমাদের বন্ধুত্বকে আরো সংহত করে তুলত। একবার আমাদের যুগোশ্লাভিয়ান কমরেডরা এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানটির মূল 'থিম' ছিল স্বদেশের ওপর বিদেশী দখলদারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এর প্রতীক হিশাবে দেখানো হয় যুগোশ্লাভিয়ান রাইয়া-র তুর্কি আগা-র বিরুদ্ধে লড়াই-এর দৃশ্য। অনুষ্ঠান শেষ হলে বেশ কয়েকজন জার্মান সহবন্দী আমাদের কাছে এসে অভিনন্দন জানান। তারা বলেন "হ্যাঁ, তোমাদের আমরা বুঝতে পেরেছি।"

এসব অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তাঁদের মাথার ওপর সবসময়ই বিপদের খড়্গ ঝুলত। শরীর ও জীবন প্রতিমুহূর্তে বিপন্ন। একটি উদাহরণ :

"একবার জার্মান যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রুডি আর্নডট্ একটি স্ট্রিং কোয়ার্টেট-এর আয়োজন করে। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাড়ভাঙা, অমানুষিক পরিশ্রম। আধপেটা সিকিপেটা খাওয়া। তা সত্ত্বেও সে ও তার কয়েকজন বন্ধু বন্দীশিবিরের অন্ধকারে সংগীত চর্চা করত। এর জন্যে প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র এবং স্বরলিপি তারা বহু কষ্টে যোগাড় করে। বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ছিল ভায়োলিন, ভায়োলা, চেলো ইত্যাদি। যোগাড় ত হল, কিন্তু শিবিরে আনানো যাবে কীভাবে? সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, ধরা পড়লে অবধারিত মৃত্যু, সেগুলি স্মাগল্ করা হল শিবিরে। শিল্প ও সংগীতের প্রতি কি অসামান্য ভালবাসা! বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান তারা করে। প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরুর আগে রুডি ছোট্ট ভাষণ দিত। জার্মান ধ্রুপদী সংগীতের এই সুরগুলির মর্ম এবং জার্মান সাহিত্যে এদের প্রভাব ও অবদানের কথা ব্যাখ্যা করত। এঁদের পরিবেশিত মোৎসার্টের 'লিটল নাইট মিউজিক' শোনা শ্রোতাদের কাছে ছিল এক অসাধারণ, প্রায় স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা।

"এঁদের অনুষ্ঠানগুলি হত গোপনে। কিন্তু ইঁদুর আর ছুঁচো ত সব জায়গাতেই থাকে। এই অনুষ্ঠানের কথা এক 'ছুঁচো' [ফ্যাসিস্টদের গুপ্তচর।— লেখক] এস এস-এর কাছে তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করে। রুডির বন্ধুদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন ইহুদি। তাঁদের জন্যে বরাদ্দ করা হয় বিশেষ শাস্তি। তাঁদের অপরাধ, ইহুদি হয়ে খাঁটি আর্য সংগীত পরিবেশনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন তাঁরা। এস এস তাঁদের উপহার দেয় চাবুকের বাড়ি—পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ঘা পর্যন্ত। সেই পাঁচজনের একজন আর সেই 'মারের মাঠ' থেকে ফিরে আসেন না।" (বুখেনওয়াল্ড, ওয়ার্নিং অ্যান্ড ডিউটি, ডকুমেন্টস অ্যান্ড রিপোর্টস, বার্লিন, ১৯৬১)।

কিন্তু এত ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক? 'তুচ্ছ গানবাজনার' জন্যে এত বিপদ ডেকে আনা কি যুক্তিসংগত? যাঁরা এই ঝুঁকি নিতেন সেই বন্দীদের মত কী? প্রাক্তন জার্মান বন্দী এমিল কার্লেবাখের মতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বন্দীদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করত, তাঁরা যা পেতেন এগুলি থেকে তা বিবেচনা করে কোনো দ্বিধা না করেই বলা যায়, এ ধরনের ঝুঁকি নেওয়া যথেষ্ট ন্যায় ও যুক্তিসংগত ছিল। তিনি লিখেছেন—

"এস এস-এর অত্যাচার ও নির্যাতন ছিল পাশবিক। তার ফলে শুধু দৈহিকভাবেই নন, মানসিক দিক দিয়েও বন্দীরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিছু একটা করতে হয়। কিন্তু সেটা কী? ভাবতে ভাবতে রুডির মাথায় এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা এল। তিনি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বন্দীদের শুধু মনোরঞ্জন নয়, তাঁদের ভেতরে বাঁচার

আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় করার এবং প্রতিরোধ করার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাইশ নম্বর ব্লক থেকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন চারজন কুশলী শিল্পী, তাঁরা ইহুদি। একদিন উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পর শিবিরে ফিরে রুডি ও তার বন্ধুদের কাণ্ড দেখে আমি হতবাক। দেখি, কয়েকটা ভাঙাচোরা বেঞ্চ যোগাড় করে তারা সেগুলো সাজিয়েছে। তার ওপর বসে আছেন শীর্ণ, দীর্ণ কিছু বন্দী। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে রুডির দল বাজনা বাজাচ্ছে। কী বাজছে ? মোৎসার্ট। ওহ্, মোৎসার্ট ! আত্মসমর্পণ অথবা আত্মহত্যার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো আমরা যেন অকস্মাৎ জীবনের স্বাদ পেলাম, সেই জীবন যা একদিন আমাদের ছিল কিন্তু আজ শত চেষ্টাতেও তার কণামাত্র স্মৃতিও খুঁজে পাই না। সমস্ত শরীরে এবং মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এক অদ্ভুত শক্তি, যেন দৈবিক। একটু একটু করে সেই শক্তি আমাদের চাঙা করে তুলতে থাকল। বেঞ্চের প্রান্তে বসে চোখ বুজে বাজনা শুনছি, কানের ভেতর দিয়ে সুর চলে যাচ্ছে বুকের গভীরে। সেখানে, সেই গভীর থেকে কে যেন মাঝেমাঝেই বলে উঠছে, "ওঠো, জাগো, লড়াই করো, বাঁচো। এমিল, 'বাঁচো' !...রুডি, তার বন্ধুরা এবং মোৎসার্ট ফিরিয়ে দিলেন আমাদের আত্মমর্যাদা, মনুষ্যত্ববোধ আর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা।"

এমনি করেই চলতে থাকে বন্দীদের সংগীত চর্চা এবং সংগীতকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা আর বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। যাবতীয় বিপদ অগ্রাহ্য করেই চলতে থাকে। অ্যান্টনিন ওয়াইজারের ভাষায়—

"শিবিরে এস এস নিয়ন্ত্রিত 'সরকারি' সংস্কৃতির চেহারাটা ছিল মোটামুটি এই রকম, একটি লাইব্রেরি (তাতে বেশির ভাগই নাৎসি প্রচারের বই। চোরাগোপ্তা ঢুকে পড়া কিছু ভাল বইও ছিল, এস এস-এর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই ঢোকানো হত এসব বই), একটি সিনেমা যেখানে ওদের বিজয়প্রচার দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য, একটি রেডিও সেন্টার যা ছিল সম্পূর্ণই এস এস-এর নিয়ন্ত্রণে এবং একটি চেম্বার মিউজিক গ্রুপ। গোটা ব্যাপারটাই নাৎসিদের কুক্ষিগত, বন্দীদের কোনো প্রভাবই ছিল না। কিন্তু চেম্বার মিউজিকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। এই গ্রুপের পরিচালক ও সদস্যরা বেশির ভাগই ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়া থেকে আসা বন্দী। রঙিন পোশাকে সাজতে হত তাঁদের এবং গোড়ার দিকে বাজাতে হত অত্যন্ত মোটা দাগের নাৎসি মার্চিং সং-এর সুর। তা-ই বাজাতেন তাঁরা এবং অপেক্ষায় থাকতেন সুযোগের। ধীরে ধীরে এঁরা একটা একটা করে অন্যান্য মার্চিং সং-এর সুর বাজাতে শুরু করেন। শিবিরের বন্দীরাই রক্ষা করতেন এইসব সুর এবং শিবিরেই প্রথম এগুলি বাজানো হয়। বাইরে এগুলি ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য শিবিরের মাথামোটা, স্থূল রুচি এস এস পাহারাদারদের অজ্ঞতারই সুযোগ নিতেন বন্দীরা। এইসব সুরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্টালিনগ্রাড মার্চিং সুর, ইনভেশন মার্চ-এর সুর ইত্যাদি।

"এই জাতীয় সুরের অধিকাংশই রচনা করেন প্রবীণ চেক শিক্ষক আন্দ্রেই ফোলবার। ১৯৪৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি অ্যাংলো-মার্কিন বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণে নিহত বন্দীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আন্দ্রেই একটি শোকসংগীতের সুর রচনা করেন। রোলকলের লাইনে যাবার সময় খুব মনে পড়ত সেই সহবন্দীদের কথা। তখন প্রাই আমরা এই সুরটি গাইতাম। এমন কি এস এস-এর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদেরই ক্যাসিনোতে তাদের সামনেই আন্দ্রেই প্রায়ই এই সুরটি পরিবেশন করতেন।

"কখনো সখনো বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে চেম্বার মিউজিক গ্রুপ অন্য জাতীয় কনসার্ট বাজাবার অনুমতি পেতেন। তখন আমরা শুনতে পেতাম 'বিক্রীত বধূ' 'ডালিবর' ইত্যাদি



অপেরাব নির্বাচিত অংশ। পরিবেশনার গুণমান হয়ত সাংঘাতিক উঁচুমানের হত না, কিন্তু শিবিরেব সেই পরিবেশে সেই সংগীতই আমাদের কানে স্বর্গীয় সংগীতের মত বাজত। এই চেম্বাব মিউজিকের সদস্যারা পবে একটি কালেকটিভ তৈরি করেন। বন্দীদের জন্মদিনে বা কাবাবাসেব বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে এঁরা বাজনা বাজাতেন। অনেকের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর, কোনো কোনো কমিউনিস্টের ক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত বন্দীজীবনের কাল পূর্ণ হয়।

"১৯৪৩ সালের শবতে শিবিরের বেশ কিছু তরুণ ও যুবক বন্দী মিলে গড়ে তোলেন একটি আন্তর্জাতিক জ্যাজ অর্কেস্ট্রা। পরবর্তীকালে এঁরা গ্রুপটির নাম দেন, 'ইয়াং চেক্স বোহেমা কালেকটিভ'। এই দুটি গ্রুপ পরস্পবের পবিপূরক হিশাবে কাজ করতেন। সংগীত ছাড়াও স্যাটয়ার ও ব্যঙ্গগীতি পরিবেশনায় এঁরা বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। আমার স্মৃতির আজও আটকে আছে এঁদের একটি অনুষ্ঠানে শোনা কয়েকটি লাইন—

আমরা জানতে পেরেছি
কী করে সূর্য আর বরফ
শরীরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে,
অভাব, প্রহার, ক্ষুধা ও রক্তের কী স্বাদ
যখন তারা এল
যারা কেড়ে নিল আমাদের ডানা
আর বাঁধল আমাদের কাঁটাতারের বেড়ায়।
তোমরা ত জানো
জগৎ জুড়ে কী চলছে
যখন তারা টানাহ্যাঁচড়া করছে
একটা লাশ নিয়ে।
যা কিছু নিয়ে নেওয়া যায়
সবই লুটপাট হয়ে গেল।
বাকি যা রইল
তা হল এই করদ রাজ্য।

এইসব তরুণ বন্দী দুটি দৃশ্যের মাঝখানে বিশ্রামের সময় এস এস-এর প্রায় দোরগোড়ায় বসে এমনভাবে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চালাতেন, দেখে মনে হত তাঁরা যেন বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ও মুক্ত মঞ্চে কাজ করছেন। প্রায়ই তাঁরা এইভাবে বিভিন্ন জাতীর বন্দীদের সঙ্গে ভাবনাচিন্তা বিনিময় করতেন। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতেন তরুণ চেক বন্দীবা।

"বয়স্ক চেকরাও নিজেদের সংঘবদ্ধ করেন। এটা তাঁরা করেন একটি কোরাস গ্রুপের মাধ্যমে। এই গ্রুপের সদস্যরা প্রায় সবাই ছিলেন গান-পাগলা মানুষ। চেক কোরাস সংগীত এঁরা এতই ভাল জানতেন যে চোকোশ্লোভাকিয়া থেকে গোপন পথে মিউজিক্যাল নোটস শিবিরে এসে পৌছনোর আগেই এঁদের অনেকে স্মৃতি থেকে সেসব গানের নোট লিখে ফেলেন। দারুণ উৎসাহে তাঁরা গাইতেন স্মেটানার 'দ্য ব্রাইড গিফট' এবং 'দ্য ফেস্টিভ কোর', ফস্টারের 'ফিল্ড স্ট্রিট' এবং নানা গণসংগীতের কোরাস। এঁদের মধ্যে কয়েকজন সোলোয়িস্টও ছিলেন। তাঁরা ছিলেন রীতিমত গুণী এবং সে গুণের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যেত তাঁদের অনুষ্ঠানে।

"এখানে বন্দীদের অনুভূতি ও চেতনা কোন পর্যায়ে পৌঁছায় তা আঁচ করা যাবে একটি বিবরণ থেকে। নবাগত এক সংগীত কুশলী বন্দীর কোবাস গ্রুপে যোগদানের বিবরণ। প্রথম কিছুদিন তাঁকে বাজিয়ে দেখা হয় অর্থাৎ তাঁর মানসিকতার পরীক্ষা চলে। এই পর্যাযেব পর তাঁকে দেওয়া হয় প্রাথমিক সাহায্য, একটুকরো রুটি, এক ফালি কাপড ও একজোড়া পুরনো জুতো। তারপর শিবিরের বন্ধুরা তাঁর সম্মানার্থে দিলেন গেস্টডিনার। যেন পরীক্ষা পাশের ভোজ।

"টেবিলেব ওপর রেখে দেওয়া হয়েছে একখানা বই। নতুন বন্ধুটি বইটি তুলে পাতা ওলটান। তাঁর সারা মুখে, দুই চোখে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও আনন্দ। বইখানা 'দ্য ব্রাইড ওঅজ সোলড'-এর একটি কপি। হাসিমুখে তিনি তাকান সহবন্দীদের দিকে। সব মুখেই তখন হাসি। দুই হাতে খুশি নিয়ে সহবন্দীরা এঁকে একে চেপে ধরেন নবাগত বন্ধুটির হাত। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরপব কয়েকটি চাপা ঘরের মধ্যে দিযে ওই রকমই চাপা ও নিচু একটি ঘরে। সেখানে আমাদের রেওয়াজ চলে। প্রায় চল্লিশ জন বন্দী অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। নতুন বন্দীটি ঘরে ঢুকতেই তাঁরা ঘাড় নিচু করে শুরু করলেন স্মেটানার 'দ্য ব্রাইড গিফট'-এর নির্বাচিত অংশ। এভাবেই স্বাগত জানানো হল পরীক্ষা-পাশ নতুন বন্ধুটিকে। তারপব শুরু হল সবাব সঙ্গে পরিচযের পালা।

"এইসব ঘটনা সাময়িকভাবে হলেও একটা অলৌকিককে সম্ভব করে তুলত। কাঁটাতারের পেছনে বন্দীদের যন্ত্রণালাঞ্ছিত জীবনকে কিছুক্ষণের জন্যে একটু দূরে সবিযে বাখত। এই মুহূর্তগুলিতে তাঁরা অনুভব করতেন চরম অপমান আর চূড়ান্ত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাঁরা বেঁচে আছেন, মানুষ আছেন, মনুষ্যত্ব হারান নি।

"শিবিরের প্যাথলজি বিভাগটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল বন্দীদের মিলনস্থল। বাইরে থেকে দেখতে একই রকম, অন্য যে কোনো ব্যারাকের মতই। ভেতরে একেবারে অন্য জগৎ। মৃতদের জগৎ। ক্ষুধায় বা অসুখে মৃত, দুর্ঘটনায় মৃত বা খুন হযে যাওযা মৃতদেব ব্যারাক। মৃত বন্দীদের দেহে রাসায়নিক মাখিয়ে এখানে রেখে দেওয়া হত। চারপাশের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কান, ফুসফুস, উলকি আঁকা মানুষের চামড়া, হাতের মুঠির চেয়ে সামান্য বড় মানুষের মাথার খুলিও…।

"এই ঘরে ঢুকলেই মনে হত দম বন্ধ হয়ে বুক বুঝি ফেটে যাবে। ঘরের বাতাস আচ্ছন্ন যন্ত্রণা আর বেদনার স্মৃতিতে। কিন্তু শিবিরটা ত বুখেনওয়াল্ড এবং আমরা ত বন্দী। এখানে বেঁচে থাকতে হলে টিকে থাকতে হলে অকল্পনীয় পরিস্থিতির সঙ্গেও মানিয়ে নিতে হত বন্দীদের। এস এস-এর বীরপুঙ্গবরা এই ঘরের কাছাকাছি বড় একটা ঘেঁষত না। ফলে বন্দীদের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্র হিশাবে এটি ছিল চমৎকার জায়গা। গাইয়ে-বাজিয়েরা এখানে চালাতেন তাঁদের সংগীতচর্চা, বিশেষ করে যে চর্চা তাঁরা এস এস-কে এড়িয়ে করতে চাইতেন। স্ট্রিং কোয়ার্টেট গ্রুপের সদস্যরা যে এই ঘরটিকেই তাঁদের রেওয়াজের জায়গা হিশাবে বেছে নিয়েছিলেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানে ভায়োলিন বাজাতেন প্যারিস কনজারভেটোরিয়ামের এক প্রখ্যাত প্রফেসর। বাকি তিনজন ছিলেন পোল্যান্ডের অধিবাসী। এঁরা এখানে মৃতদের এই ঘরে, চর্চা করতেন বেটোফেন, মোৎসার্ট, হেডন এবং অন্যান্য ধ্রুপদী সুরস্রষ্টাদের সংগীত।"

কয়েকজন বিখ্যাত চেম্বার মিউজিকার বুখেনওয়াল্ডে বন্দী হয়ে এলে কিছু দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় একটি কোয়ার্টেট গড়ে ওঠে। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন চেক। এঁরা বাখ,

বোকারিনি, স্মেটানা, গ্রীগ প্রমুখ সুরস্রষ্টার সংগীত চর্চা করতেন। প্রথম গ্রুপটির চেয়ে অনেক বেশি কষ্টেব মধ্যে এঁদের কাজ করতে হত। রেওয়াজের জায়গা জোটাই দায়, কখনো এখানে কখনো ওখানে সুর সাধতে হত। তবে কিছুদিনেব মধ্যেই দুই গ্রুপের মধ্যে চমৎকাব সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁরা যৌথ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

কনসার্টগুলি অনুষ্ঠিত হত রাত্রে। চেক ব্যারাকেও অনুষ্ঠানেব শুরুতে সংগীত, সুব ও সুরকাব সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলে দেওয়া হত বিভিন্ন ভাষায়।

বুখেনওয়াল্ডে শিল্প ও সংগীত নিয়ে নানা আলোচনাচক্রও অনুষ্ঠিত হত। বিশেষ করে স্মেটানা ও তাঁব সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা চলত। একবাব নাৎসিদের দ্বারা পরিচালিত একটি চেক কাগজে স্মেটানা সম্পর্কে একটি লেখা প্রকাশিত হয। তাতে বলা হয়, চেক সংগীত এমন কি স্মেটানাও জার্মান আর্যসংগীতের প্রভাবে ও ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাচক্র ডাকা হয় এবং সেখানে এই মিথ্যা প্রচার ও কুৎসার জবাব দেওয়া হয। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় দারুণ উৎসাহে, রীতিমত সফল সভা। আরো কয়েকটি আলোচনাচক্র খুব জমে ওঠে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জ্যাজ সংগীত ও চেক রূপকথা নিয়ে আয়োজিত আলোচনা।

"এইভাবেই সংগীত হয়ে ওঠে নানা জাতির মানুষেব মধ্যে মৈত্রী আব সহযোগিতার মাধ্যম। তরুণ চেক বন্দীদের সঙ্গে প্রায় শখানেক নরওয়েজিয়ান বন্দীর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এ বন্ধুত্বেরও সেতু ছিল সংগীত। নরওযেজিযান ব্লকটি ছিল চেক ব্লকের কাছেই। একবাব চেকরা তাঁদেব বিদেশী বন্ধুদের জন্যে একটি ছোট্ট কনসার্টের আয়োজন করেন। নরওয়েজিয়ানরা দারুণ খুশি হন। কিছুদিন পরে চেকরা তাঁদেব দেশ ও সংগীতের একটা ছোট ইতিহাস লিখে তাঁদের ব্লকে পাঠিয়ে দেন। জবাবে নরওযেজিযানরাও তাঁদেব দেশ ও সংগীত সম্পর্কে একটা লেখা তৈরি করে উপহার দেন চেক বন্ধুদের। এইভাবে দুই জাতির বন্দীদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।



"আমাদের কোয়ার্টেট একবার নরওয়ে ব্লকে একটা ছোট আসর বসায়। নরওয়েজিয়ানরা আমাদের উপহার দেন বই এবং তাঁদের দেশের সুস্বাদু খাবার (কীভাবে যোগাড় করেছিলেন কে জানে!)···প্রায়ই আমরা জানলা গলিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসতাম। বেড়াতে যেতাম একে অপরের ব্লকে।

"আন্তর্জাতিক শিবির কমিটি সব সময়েই চেষ্টা করতেন যাতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত বন্দীরা অন্তত কিছুটা সময় পান। চেষ্টা করা হত তাঁদের এমন কাজ দিতে যাতে কম পরিশ্রম করতে হয়। উদ্দেশ্য, তাঁরা যাতে শারীরিক দিক থেকে কাহিল হয়ে না পড়েন। একথা মানতেই হবে শিবির কমিটির এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই বুখেনওয়াল্ড বন্দীদের পক্ষে মার্চ সং, কোরাস, মিউজিক ও অন্যান্য সংগীতের অনুশীলন করা সম্ভব হয়। অর্কেস্ট্রা ও অন্যান্য ধরনের বাদ্যযন্ত্রসংগীতের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়।

"বুখেনওয়াল্ডের সেই নারকীয় পরিবেশের মধ্যেও জীবনকে মানুষের উপযোগী ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্যে বন্দীদের প্রাণপণ প্রয়াসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি শিশুবন্দীদের জন্যে সংগঠিত স্কুলের কথা বলতে ভুলে যাই। শিবিরের সবচেয়ে ছোট্ট বন্দীটি ছিল তিন বছরের এক নিষ্পাপ শিশু। সবচেয়ে বেশি বয়সীরা ছিল দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে। ততদিনে এদের অনেকেই নাৎসি জেলে ও বন্দীশিবিরে কয়েকবছর কাটিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে এই শিশুদের অনেককেই নাৎসিরা গ্যাস চেম্বারে ঠেলে দেয়—বিশেষ করে সোভিয়েত, পোলিশ ও জিপসি শিশুদের। কিন্তু ১৯৪৪ সালের গোড়াতেও বহু শিশুকে দাস শ্রমিকের কাজ করতে হত। মাঝেমাঝেই দেখা যেত এইসব শিশুদের কেউ কেউ খাবারের অভাবে, শীতে কাজের চাপে. নাৎসিদের নিপীড়ন এবং শিবিরের পাশবিক পরিবেশে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দেখেশুনে এদের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা ও রক্ষা করার জন্যে কিছু চেক বন্দী এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁদের উদ্যোগে ছোটদের জন্যে



পড়াশুনার এবং গানের স্কুল খোলা হয়। আরো কিছু পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আগস্টে মিত্রপক্ষের বোমা বর্ষণে শিবিরের ফ্যাক্টরিটি ধ্বংস হয়ে গেলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

"এই সময় থেকে বুখেনওয়াল্ডে বন্দীদের মধ্যে খানিকটা সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় বন্দীকে চালান করে দেওয়া হয় অন্যান্য শিবিরে যেখানে কারখানা তখনো অটুট ও সচল। অন্যদিকে মিত্রপক্ষের আক্রমণে বিপন্ন নানা শিবির থেকে বুখেনওয়াল্ডে নিয়ে আসা হয় হাজার হাজার বন্দীকে। শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে নানা ধরনের ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারী। মৃত্যুর হার সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। একসময় হিশেব করে দেখা যায়, এভাবে চলতে থাকলে শিবিরের একজন বন্দীও আর জীবিত থাকবেন না। পরিস্থিতি এমনই যে কয়লার অভাবে শবদাহ করার চুল্লীগুলি প্রায় বন্ধ, মৃতদেহগুলি পাহাড়ের মত উঁচু করে ফেলে রাখা হত খোলা মাঠে, রাস্তার ওপরে, এধারে ওধারে। শিবির জুড়ে ক্ষুধা, রোগ, আর মৃত্যুর রাজত্ব।

"মুক্তির আর দেরি নেই। অথচ তীব্র এক সংকটময় সময় এসে হাজির আমাদের ঘাড়ের ওপর। এ এমন এক সময় যখন বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব অথচ বেঁচে থাকতেই হবে যেমন করে হোক। মুক্তির দেরি নেই। বাঁচার জন্যে যা যা অপরিহার্য তার কিছুই নেই, শুধু ইচ্ছার জোর ছাড়া। অথচ বন্দীরা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে হারিয়ে ফেলছে সেই ইচ্ছা। যেন মৃত্যু ও ধ্বংসের স্রোতকে অনিবার্য বলেই ধরে নিয়েছেন তাঁরা এবং সেই স্রোতে আত্মসমর্পণ করছেন নীরবে। বেঁচে থাকতে হবে এবং বাঁচিয়ে রাখতে হবে সহবন্দীদের। তার জন্যে বাঁচার ইচ্ছাকে রক্ষা করতে হবে এবং প্রবল করে রক্ষা করতে হবে। এটা করা যাবে না লড়াই ছাড়া। চেক বন্দীরা উঠে পড়ে লাগলেন সেই লড়াইয়ে। একটাই তাঁদের হাতিয়ার—সংগীত। স্মেটানা-র 'আমার জীবন থেকে' এবং সেই সঙ্গে ডভোরাক-এর কোয়ার্টেট বন্দীদের শোনাত আশার সুর, জীবনের গান, বেঁচে থাকার কামনার সুর। সে সুর আলোড়ন তুলত আমাদের বুকে, চোখের সামনে ভেসে উঠত মাতৃভূমি আর প্রিয়জনদের মুখ, ক্ষীণতনু এক ইচ্ছা—প্রিয়জনকে দেখার, মাতৃভূমির মাটি একবার স্পর্শ করার—শেষ একবার ইচ্ছা যেন প্রবল হয়ে উঠত। কোথা থেকে যে জন্ম নিতে এক নতুন জীবনশক্তি, মনে হত, বেঁচে থাকতেই হবে, যেমন করে হোক বাঁচতেই হবে।

"এইভাবে এল ১৯৪৪ সালের বড়দিন। জনা দশেক চেক বন্দী গোটা শিবির ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলেন বড়দিনের গান, শুভেচ্ছার গান। 'ভাইয়েরা, তোমাদের জানাই বন্দীদশায় শেষ বড়দিনের শুভেচ্ছা, পরের বড়দিনে দেখা হবে মুক্ত, স্বাধীন দেশে। আমাদের মুক্তি যে আসন্ন··· আর কটাদিন, এই কটাদিন বেঁচে থাকো, টিকে থাকো যেমন করে হোক। বেঁচে থাকো··· !'

"তাঁরা টিকে থাকলেন এবং এই অসম্ভব কঠিন কাজটি করার, টিকে থাকার শক্তি জোগাল সংগীত।"

শুধু প্রকাশ্য বা গোপন অনুষ্ঠানেই নয়, সংগীতের সাহায্যে সংগ্রামের পথ নেওয়া হত অন্য জাতের অনুষ্ঠানেও। যেমন, পয়লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করার উদ্দেশ্যে অথবা থেলমানের স্মরণ সভায়। প্রখ্যাত জার্মান শ্রমিক নেতা এর্নস্ট থেলমানকে বুখেনওয়াল্ডে নিয়ে এসে নির্মমভাবে খুন করা হয়। তখন স্পষ্টতই যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। জার্মানির এই মহান সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে বুখেনওয়াল্ডের ডিসইনফেকশন বিভাগে একটি সভার আয়োজন করা হয় ১৯৪৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই সভাটি করা হয়। সংগীত ছিল সেখানেও সহায়।

বুখেনওয়াল্ডে সংগীতচর্চার ফর্ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রাক্তন চেক বন্দী মিরোস্লাভ হেইটমার লিখেছেন

"...অবশেষে আউসউইৎস রইল পেছনে। বুখেনওয়াল্ডে প্রথমেই আমার নজর পড়ল শিবির অর্কেস্ট্রার ওপর। যদিও এর উদ্দেশ্য ছিল নাৎসিদের জন্যে বাজনা বাজানো এবং তাদেরই মনোরঞ্জন, বুখেনওয়াল্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও উদ্দেশ্যের সংগীতচর্চাও চোখে পড়ল। কোরাস গান থেকে শুরু করে চেম্বার মিউজিক পর্যন্ত নানা ফর্মে। অনেকগুলো গ্রুপ এই চর্চা চালিয়ে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে একটি গ্রুপ আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। নানা জাতির মানুষ নিয়ে গড়া শিবিরের জ্যাজ অর্কেস্ট্রা। গ্রুপটি ছিল আধা বৈধ। আউসউইৎস-এও এ ধরনের গ্রুপ ছিল। কিন্তু তারা সঙ্গীত মূলত এস এস-এর মনোরঞ্জন করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

"বুখেনওয়াল্ডে এসে আবিষ্কার করলাম এখানে বন্দীরা শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বাজনা বাজান না। সংগীতের মাধ্যমে তাঁরা হয়ে ওঠেন পরস্পরের সহযোদ্ধা, কমরেড। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার এবং সহবন্দীদের বাঁচাবার লড়াইয়ে সাহসী সৈনিক। সমস্ত জাতির মধ্যে মৈত্রী এবং সব বন্দীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলাই তাঁদের সংগীতের মূল লক্ষ্য।

"এই জ্যাজ গ্রুপটির একটি ইতিহাস আছে। অনেক ত্যাগ ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে বন্দীরা বাদ্যযন্ত্রগুলি যোগাড় করেন। কোনো বন্দী একটা যন্ত্রসহ ধরা পড়লে তাঁর কপালে জুটত নিদারুণ দুর্ভোগ। বলা বাহুল্য বাজনাটি সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হত। বাজেয়াপ্ত বাজনাটি চালান করে দেওয়া হত একটি বিশেষ গুদামঘরে। সেখানে যে বন্দীরা কাজ করতেন তাঁরা অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতেন সংগীতের গ্রুপগুলিকে। তাঁরা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া যন্ত্র গোপনে বের করে আনতেন গুদাম থেকে এবং সেটি ফিরিয়ে দিতেন গ্রুপের হাতে। এছাড়া প্রয়োজনে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে বাদ্যযন্ত্র ধারও দিতেন। এইভাবে চলত সংগীতচর্চা।

"এছাড়া অন্য সমস্যাও ছিল, ভেতরের সমস্যা। সংগীতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারের সমস্যা। শিবিরের বেশ কিছু বন্দী, বিশেষত, বয়ঃজ্যেষ্ঠরা মনে করতেন, জ্যাজ সংগীত মূলত, উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজের ব্যাপার, ওদের কাজ না করার ফন্দী। এটাকে তাঁরা বস্তুতপক্ষে অপসংস্কৃতি বলেই মনে করতেন। পরে অবশ্য তাঁরা বুঝতে পারেন, জ্যাজ আসলে তরুণদের বয়সোচিত প্রমোদসংগীত। শুধু তাই নয়। এই সংগীতের মধ্যে দিয়ে তাদের লড়াইয়ের মেজাজও একটা চেহারা পায় ও প্রবলতর হয়ে ওঠে।

"আমাদের এই জ্যাজ অর্কেস্ট্রার গ্রুপটি ছিল সত্যিসত্যিই আন্তর্জাতিক। এ পাশে বাজাচ্ছেন অস্ট্রাভার ইস্পাত কারখানার এক শ্রমিক, তাঁর পাশেই বাজনা হাতে প্লজেনের এক ঢালাই মিস্ত্রি, তাঁদের সঙ্গে অন্য একটি যন্ত্র বাজাচ্ছেন এক ফরাসি শিক্ষক এবং পেছনে দাঁড়িয়ে সুরে সুর মেলাচ্ছেন তাঁর এক চেক ছাত্র। এই চেক ছেলেটির বাবাকে নাৎসিরা ফাঁসি দেয় এবং তাকে চালান করে বুখেনওয়াল্ডে।

"বুখেনওয়াল্ডের জ্যাজ অর্কেস্ট্রা একটি জিনিশ দেখিয়ে দিয়েছিল। তা হল, শুধু কী বাজাচ্ছি বা কেমন বাজাচ্ছি সেটাই শেষ কথা নয়, অস্বাভাবিক এই পরিস্থিতিতে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কে বাজাচ্ছে এবং কেনই বা বাজাচ্ছে। দুপুরে বিশ্রামের সময় খুবই সামান্য। সন্ধেবেলায় রোলকলের পর শরীর আর বয় না, বিশ্রামের জন্যে আকুল। তবু দুপুরের এই ছোট্ট সময় এবং রোলকলের পরের সময়টুকুই আমরা কাজে লাগাতাম শিবিরে বন্দী কয়েকজন প্রখ্যাত সংগীত বিশারদের কাছে ট্রেনিং নেওয়ার জন্যে। এত কষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল একটাই। কখনও সখনও একটু সুযোগ পেলেই কোনো একটা ব্লকে আশাহীন, বন্দী

মানুষগুলোকে একটু আশা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া, মৃতপ্রায় বন্দীদের একটু প্রাণের স্পর্শ দেওয়া… ।

"জ্যাজ অর্কেস্ট্রার প্রোগ্রামের ভিত্তি ছিল, এবং উৎসও, ইয়ারোস্লাভ জেজেক-এর সৃষ্টি—তাঁর সুর । অন্যান্য জাতির সংগীতপ্রেমীরা এভাবেই তাঁর সুরের সঙ্গে পরিচিত হন । তবে শুধুমাত্র জেজেক নয়, আমাদের গ্রুপের সদস্যদের মৌলিক অবদানও ছিল । তাঁদের লেখা কথা ও তৈরি সুর গাওয়া ও বাজানো হত । এই প্রসঙ্গে ভি নেজভাল এবং এইচ হাইন-এর সুর ও রচনার কথা উল্লেখ করা যায় । এছাড়া আমরা কিছু কিছু নিগ্রো সুর বাজাতাম, তার অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ক্ল্যাসিকাল নিগ্রো সুর হয়ে ওঠে । যেমন, সেন্ট লুইস ব্লুজ এবং ডিউক এলিংটনের কম্পোজিশন ।



"আমাদেব এই গ্রুপই ইউরোপেব মাটিতে প্রথম গ্লেন মিলাবের 'ইন দ্য মুড' বাজায় যা পরবর্তীকালে প্রচুব খ্যাতি লাভ করে । এব ফলে এক অদ্ভুত প্যারাডকসের সৃষ্টি হয় ! তৃতীয় রাইখের কঠোব জাতিতত্ত্বেব বিচারে অশুদ্ধ ও সেই কারণে নিষিদ্ধ সংগীতেব চর্চা চলত তাদের একেবারে নাকেব তলায়, খোদ বুখেনওয়াল্ডে । এবং সে চর্চাও করত কারা ? নানা জাতির মানুষ নিয়ে গড়া এক আন্তর্জাতিক বন্দী-গ্রুপ । গ্রুপটি আক্ষরিক অর্থেই এমন আন্তর্জাতিক যে এবকম একটা গ্রুপ সম্ভবত পরবর্তীকালেও, মুক্ত ইউরোপেও, আর গড়ে ওঠে নি । আমাদের আন্তর্জাতিক শ্রোতৃমণ্ডলী ঠিকই বুঝে নিতেন জ্যাজের আসল বক্তব্য । 'শুদ্ধ আর্য জাতি'র ধ্বজাধারী এস এস বীরপুরুষরা কিন্তু বুঝত না ব্যাপারটা ।

"জ্যাজ আঁসাম্বল-এর একটি অঙ্গ ছিল চেক গণসঙ্গীতেব একটি গ্রুপ । এরা প্রধানত ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের গান গাইত । এই বন্দীশিবিরেই গ্রুপটির জন্ম ।"

এই ধরনের লড়াইয়ের গান যখন তৈরি হত বা বন্দীদের সামনে গাওয়া হত তখন শিল্পীদেব তথা বন্দীদের জীবন কিন্তু প্রতিনিয়ত বিপন্ন । গোপন কাজকর্ম ধরা পড়া মানেই চরম লাঞ্ছনা, নির্মম দৈহিক নির্যাতন এবং প্রায়শই মৃত্যু । এইসব সৃষ্টি তাই একই সঙ্গে বন্দীদেব সম্মানহানি, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ইতিহাস এবং মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্যে তাঁদের আমরণ সংগ্রামের সাক্ষী । বন্দীশিবিরের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের শত শত বন্দীকে খুন কবা হত । তার মধ্যেও শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ ফ্যাসিবাদের

বিকৃত জীবনদর্শনের সঙ্গে ক্রমাগত পাঞ্জা লড়ে গেছেন। সে লড়াইয়ে তাঁদের হাতিয়ার ও শক্তির উৎস ছিল শিল্প, সাহিত্য আর সংগীত। এই সত্যের সাক্ষী হয়ে আছে বহু কবিতা আর গান। বলা যেতে পারে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কুর্ট থোমাসের ভাষায়—

"কঠিন জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতার ফসল এই রচনাগুলি নিতান্তই ভয়ের বা হতাশার নয়। কাঁটাতারে ঘেরা মানুষ, মৃত্যু দিয়ে ঘেরা জীবন—সেখানেও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত লড়াই, একতার বাণী, আন্তর্জাতিকতাবাদ, মহান মানবিক মূল্যবোধ, সর্বোপরি ভবিষ্যতের স্বপ্ন থাকতে পারে, আছে। এই সত্যই প্রতিফলিত এইসব রচনায়। দৃষ্টান্ত হিশাবে বলা যেতে পারে একটি গানের কথা যেটি লিখেছিলেন কুর্ট উলফগ্যাং, সুর কে দিয়েছিলেন তা জানা যায় নি।

শক্ত হও, কমরেডরা
জাল, প্রাচীর, কাঁটাতার
এই হল আমাদের জগৎ
সাবধান, বন্দী কমরেডরা, সাবধান !
সোজা হয়ে যে দাঁড়াতে পারবে না
সে যাবে পড়ে।
দৃঢ় হও কমরেডরা, যারা এ শিবিরে আছ
মাথা উঁচু করো, দাঁতে চেপে থাকো দাঁত
বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও,
আসবে সোনালি সূর্যের আলো
আমাদের জীবনেও।
যদি আমবা কাঁধে কাঁধ না মেলাই
পাববে না নিজেকে টিকিয়ে রাখতে
একা একা মানুষ শুধু তলিযেই যেতে পারে
দৃঢ় হও কমরেডরা···
শক্ত হও·

"সব রচনা হাতে পাওয়া যায় নি। যুদ্ধে অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। কিছু আছে কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে। শিল্প হিশাবে এর সবই যে উঁচুমানের তা হয়ত নয়। কিন্তু প্রত্যেকটিই অদম্য মানবতাব সাক্ষ্য। এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করে আগামী প্রজন্মেব মানুষকে বাববার সচেতন ও সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।"

শিল্পমান সম্পর্কে বলতে গেলে একথা বলতেই হবে বুখেনওয়াল্ডে যন্ত্রসংগীত খুবই উঁচু মানে পৌঁছয় এবং তার রূপও ছিল বহুমুখী। দৃষ্টান্ত অনেক, তার কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জোসেফ ক্রেপিনস্কির মার্চিং সং, স্ট্যানিস্লাভ নোভাকি ও আন্দ্রেই ফোলরাব এবং অন্যান্য কয়েকজন শিল্পীর যন্ত্রসংগীতের সুর। গুস্টলফ ওয়ার্কশপের লেটারহেডে লেখা সিমফোনি ওয়ালজারের একটি নোট থেকেও বোঝা যায় কথাটা। তবে শিবিরে গানেব একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। বন্দীদের সচেতন করার কাজে এবং তাঁদের মনে বল যোগাবার ব্যাপারে গান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গানের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয় বন্দীদেব অন্তহীন জীবনতৃষ্ণা। গানই তুলে ধরে মৃত্যুঞ্জয়ী মনুষ্যত্বের পতাকা। শুধু শিবিরে রচিত গানই নয়, নানা দেশের নানা ধরনের গান বন্দীদের মনের আকাশে কাজ করত। বিভিন্ন দেশের গণসংগীত, দেশাত্মমূলক গান, পল্লীগীতি, মজুরদের গান যেমন আনন্দ দিত বন্দীদের তেমনি বারবাব সাহায্য করত আরো একবার জীবনের স্বপ্ন দেখতে, নতুন করে।

গান নামক বন্ধুটি—পরম বন্ধু—বন্দীদের যাবতীয় যন্ত্রণা আর সংশয় পার করে স্মৃতি, স্বপ্ন, আনন্দ আর জীবনের ঠিকানা দিয়েছিল।

আমার ছোট গানটি

বুখেনওয়াল্ডে গাছগুলি দোলে অস্ফুট
আর্তনাদে,
আমার হৃদয়ে বাজে প্রবল তৃষ্ণার গান
ঝড় বয়ে নিয়ে যায় সেই গান
আমার সুদূর দেশের বুকে।

কোথায় তুমি ধরণী, কোথায় প্রেয়সী
জন্মভূমি
সন্তানের রক্তে ভাসা তোমার শরীর
তোমার পথের দু-পাশে শুধু কবর আর ক্রস
প্রতিদিন প্রতিরাত্রি দেখি আমি
অন্তহীন দুঃস্বপ্নে।

তোমার বনের লতা শুনিয়েছিল রূপকথা
তোমার ছোট্ট নদীর জল আলতো করে
ছুঁয়েছিল আমার বুক ;
এক শীতল আকাশ যেন আজ
মুখ ভ্যাংচায় আমার ভাগ্যকে।

ওগো বাতাস, বয়ে নিয়ে যাও আমার এই
ছোট্ট গান
নিয়ে যাও আমার সেই পোলিশ গ্রামের
কুঁড়ে ঘরে
উঠোনে গেও আমার হৃদয়ের আকুলতা
মনে রেখো আমাদের, বন্দীদের,
যারা বাঁধা আছে কাঁটাতার আর লোহার
খাঁচায়।

গান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইঙ্গে লামেল লিখেছেন, "গানগুলির অর্থ, রূপ এবং গুণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু একটা ব্যাপারে ছিল দারুণ মিল। বন্দীদের লাঞ্ছনা আর বেদনার জীবনের কথা বলার পর একটি বাণীই ফুটে উঠত সব গানে, নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে, উঠে দাঁড়াও, দৃঢ় হও, বাঁচো, মুক্তি আসন্ন। গানের মধ্যে মূর্তি পায় রাজনৈতিক বন্দীদের অসামান্য মানসিক শক্তি, চেতনার দৃঢ়তা আর সংগ্রামী মনোভাব। এ গানের বিচার সাধারণ নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিতে হতে পারে না। বিচারের আগে আমাদের বুঝতে হবে কী ভূমিকা ছিল এইসব গানের। প্রশ্ন করতে হবে, এই গান কি পেরেছিল সেই পাশবিক অত্যাচারের সমুদ্রে প্রায় ডুবে যাওয়া মানুষগুলিকে আবার মনুষ্যত্বের তীরে নিয়ে আসতে ? এই প্রশ্নের উত্তরই হবে এইসব গানের নান্দনিক মান বিচারের সত্যিকারের মাপকাঠি।"

একই প্রসঙ্গে জার্মান বুখেনওয়াল্ড-বন্দী ব্রুনো হাইলিগ লিখেছেন—

"সন্ধেবেলায় কমরেডরা গাইছিলেন গণসংগীত আর শিবিরের গান…গান গাইছিলেন প্রহৃত, লাঞ্ছিত, ক্ষুধার্ত জীবগুলি। কাজে যাওয়ার পথে এবং ফেরার সময়ও তাঁরা গান গান। সে গান গাইতে তাঁদের বাধ্য করা হয় চাবুকের আঘাতে। কিন্তু এখানে তাঁরা গাইছেন স্বেচ্ছায়, প্রাণের তাগাদায়।

"কেন গান গাইছেন তাঁরা?

"বন্দীশিবিরে ত্রাসের চাবুক মেরে মেরে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আদিম এক অন্ধকার জগতে। সেখানেও সে যখন গান গায় তখন আসলে গান গেয়ে ওঠে তার ভেতরের সেই চিরায়ত সত্তা—মানবসত্তা গেয়ে ওঠে মনুষ্যত্বের জয়গান।"

গানের কথায় হাইনৎস হেন্‌শ্‌চকে-র মনে পড়ে, "কাঁটাতারের পেছনে গায়করা গাইতেন নানা ধরনের গান, মার্চিং সং, কাপলেট, লিরিক্যাল, ফ্যাসিবিরোধী গণসংগীত ইত্যাদি। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় অসম্ভব তাৎপর্যময় ফরাসি সঁ সঁ। শিবিরে লেখা এবং টাটকা এবং বিগত দিনের বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিস্টদের আসল চেহারাটি ফুটিয়ে তুলতে এর জুড়ি ছিল না। মজা আর স্যাটায়ারে ঠাসা এই গানগুলি বন্দীদের হতাশা কাটাবার অঢেল রসদ যোগাত। শিবিরে রচিত কিছু কিছু সঁ সঁ-র নিজস্ব সুর ছিল না। তাতে সুর লাগানো হত ধার করে। ধার করার ক্ষেত্রে নানা কৌশল নেওয়া হত। এমন কি ফ্যাসিস্টদের গানের সুরও লাগিয়ে দেওয়া হত। প্রত্যেকদিন কিছু জঘন্য ফ্যাসিস্ট সংগীতের চর্চা করতে এস এস আমাদের বাধ্য করত। এর জবাবে আমরা স্থির করলাম, গাইতে যখন হবেই, ওদের সুরেই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করতে হবে ওদের—ওদের সুরে আমাদের কথায়।"

বুখেনওয়াল্ডের বিভিন্ন শিল্পী রচিত গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বুখেনওয়াল্ডের 'লাগার লীড' অর্থাৎ বুখেনওয়াল্ড শিবিরসংগীত। এ গানটি সৃষ্টির ইতিহাস লিখেছেন প্রাক্তন জার্মান বন্দী স্টেফান হেমান, ১৯৪৫ সালে—

"১৯৩৮-এর শেষে শিবিরের ফুয়েরার রোডল ঘোষণা করল, 'সব শিবিরেরই একটা করে নিজস্ব গান আছে, শিবির গান। বুখেনওয়াল্ডের নেই। এটা চলবে না। আমাদেরও চাই বুখেনওয়াল্ড-গীত। যে এটা লিখতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে দশ মার্ক।' অনেক কবি আর সুরকার লেগে গেলেন কাজে। কিন্তু এস এস-এর মন আর ভরে না, কোনো রচনাই তাদের পছন্দ হয় না। বোঝা গেল প্রগতিশীল রাজনৈতিক বন্দীদের লেখা গান এস এস সন্দেহের চোখেই দেখবে। বন্দীরা তখন এক ফন্দি আঁটলেন। শিবিরে এক পেশাদার চোর ছিল। সে ছিল ক্যাপো। এস এস-এর সঙ্গে তার খুব দহরম মহরম। বন্দীরা একটা গান লিখে তার হাতে তুলে দিলেন। তাকে বলা হল এস এস-কে বলতে যে গানটি তারই লেখা। সে ত মহাখুশি। 'বাহবা' আর পুরস্কারের লোভে খুব গর্বের সঙ্গেই সে গিয়ে গানটি জমা দিল এস এস-এর কাছে। গানটি খুব পছন্দ হয়ে গেল রোডল-এর। এই গানটিই বুখেনওয়াল্ড-সংগীত হিশেবে স্বীকৃতি পেল। গানটির আসল স্রষ্টা দু-জন অস্ট্রিয়ান বন্দীশিল্পী। কথাগুলি লেখেন লোহনার বেডা এবং সুর দেন হেরমান লিওপোল্ডী। লোহনার বেডাকে পরে চালান করা হয় আউস্‌উইৎস -এ এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। লিওপোল্ডী সময়মত নিজেকে মুক্ত করে আমেরিকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য, এস এস কোনোদিনই জানতে পারে নি গানটির আসল রচয়িতা কে বা কারা।"

অবসর সময়ে বন্দীদের এই গানটির কথা ও সুর অভ্যাস করতে হত। অবশেষে একদিন… ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর, কনকনে শীতের এক সন্ধ্যা, এক হাঁটু বরফের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এগার হাজার বন্দী, রোলকল চলছে। রোলকল শেষ হতেই তাঁদের আদেশ করা

হল, শিবির সংগীতটি গাও। গাইলেন বন্দীরা। বলা বাহুল্য সবাই ঠিক মত সুরে গলা মিলিয়ে গাইতে পারেন নি। মদে চুর রোডল রেগে টঙ হয়ে গেল। হুকুম দিল, যতক্ষণ না গাওয়া ঠিক হয় ততক্ষণ রোলকলের জায়গায় দাঁড়িয়ে চর্চা করতে হবে সবাইকে। তাই করতে হল বন্দীদের। তাতেও গাওয়া পছন্দ হল না রোডল-এর। সে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। আদেশ করল, প্রতিটি ব্লকের বন্দীরা আলাদা আলাদা করে শিবিরের দরজা দিয়ে গান গাইতে গাইতে ঢুকবে। যে ব্লকের গাওয়া তার পছন্দ হবে না তাদের আবার ফিরে যেতে হবে ঠাণ্ডা বরফ জমা রাস্তায় এবং সেখান থেকে আবার গান গাইতে গাইতে আসতে হবে। ছেঁড়া পোশাক পরা, ক্ষুধার্ত বিধ্বস্ত মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত রাত দশটা নাগাদ যখন শিবিরে ফিরলেন তখন তাঁরা ঠাণ্ডায় জমে প্রায় আধমরা। সেই অসহায়, অত্যাচারিত মানুষগুলিকে, প্রায় শাদা হয়ে যাওয়া সেই মুখগুলিকে কোনোদিন ভোলা যাবে না, দুঃস্বপ্নের সেই রাত্রি চিরকাল থেকে যাবে স্মৃতিতে।

বুখেনওয়াল্ড-গীত

দিন শুরু হলে সূর্য হাসার আগেই
'সার বেঁধে চলি দিনের কঠিন কাজে
সকালবেলার ঘন কুয়াশার মধ্যে।
কালো রং বন আকাশের রং লাল
পিঠে বয়ে থলি রুটির টুকরো তাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে চলি
যত দুঃখের ভার।

ও বুখেনওয়াল্ড, আমি পারি না তোমাকে
ভুলতে কিছুতে
তুমিই আমার নিয়তি।
তোমাকে ছেড়ে যে গেছে
তার অনুভব শুধু শুরু
মুক্তি, আহা মুক্তি কত না পরম।
ও বুখেনওয়াল্ড, কোনো শোক নয়
করব না কোনো বিলাপও
ভাবব না আর ভবিষ্যতের কথাও
যা কিছু ঘটুক জীবনকে বলি 'হ্যাঁ'
নিশ্চিত জানি একদিন হবে ভোর
আমরা মুক্ত হব।

রক্তে আমার ছুটন্ত ঘোড়া
কত দূরে মোর নারী
ভালবাসি তাকে খুব ভালবাসি
শুধু থাকত যদি সে আমারই।
শক্ত পাথুরে মাটি

তবু নিশ্চিত পায়ে হেঁটে যাই দল বেঁধে
হাতে হাতে নিয়ে গাঁইতি বেলচা আর
হৃদয়ে হৃদয়ে রাজ্যের ভালবাসা !

ও বুখেনওয়াল্ড, আমি পারি না···

রাত্রি বড়ই ছোট, কত না দীর্ঘ দিন
কানে ভাসে সেই গান বাড়িতে যা গাইতাম
তবু দেব না মনকে বিষাদের হাতে তুলে !
পায়ে পা মেলাও কমরেড, ছেড় না ছেড় না
আশা
রক্তে মোদের বয়ে নিয়ে চলি বাঁচার তীব্র
বাসনা
হৃদয়ে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে চলি
আমাদের বিশ্বাস !

ও বুখেনওয়াল্ড, আমি পারি না···

সৃষ্টি হল বুখেনওয়াল্ড-গীত, শিবিরের সরকারি গান। গানটি বন্দীদের আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা ও কুশলতার সাক্ষী। এস এস-এর স্থূলবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে কীভাবে তাঁরা তাদের ওপর টেক্কা দিতেন এটি তারই প্রমাণ। গানটি হতে হবে এমন যে এর মধ্যে দিয়ে বন্দীদের কাছে পৌঁছে যাবে আশাব বাণী ও সংগ্রামের আহ্বান অথচ এস এস তা শুনতে পাবে না। গানের কথাগুলি সেইজন্যেই একটু নরম করে লেখা। কিন্তু এ গানের গায়করা প্রত্যেকেই নিপীড়িত, অত্যাচারিত, প্রত্যেকের বুক তিক্ততায় ভরা। তাঁদের গলায় গানটির মানে যেত বদলে। তাঁরা যখন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতেন, 'নিশ্চিত জানি একদিন হবে ভোর, আমরা মুক্ত হব' লাইনদুটি শোনাত যেন যুদ্ধ ঘোষণার মত। এই অনুভূতির কথাই বলেছেন রবার্ট সিভার্ট।

"যখনই আমরা গানটি গাইতাম, আমরা আমাদের যাবতীয় ঘৃণা, ক্রোধ আর সমস্ত আশা ছুঁড়ে দিতাম বুখেনওয়াল্ডের দিকে।"

এ গান পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে গানটির সুরকার হেরমান লিওপোল্ডী লিখেছেন—

"বুখেনওয়াল্ড-গীতটি শিবিরনেতাদের খুব পছন্দ হয়। সীমিতবুদ্ধি এই নাৎসিরা গানটির প্রকৃত অর্থ, বৈপ্লবিক অর্থ ধরতেই পারে নি। যেদিন গানটি পাশ হয় সেদিন থেকেই আমরা কাজে যাওয়ার পথে, ফেরার সময়, রোলকলে যেতে যেতে, সর্বত্র এটি গাইতে থাকি। শিবিরের ফুয়েরার রোডল গানের সুরের সঙ্গে নাচতে থাকত। এক পাশে অর্কেস্ট্রায় বাজাতে হত এর সুর। অন্যদিকে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের চাবুক মারাও হত এই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।··· আমাদের গানের আওয়াজ পৌঁছে যেত আশেপাশের গ্রামগুলিতে। এইভাবে ধীরে ধীরে সুরটি ছড়িয়ে পড়ে গোটা জার্মানিতে। মিত্রশক্তির সৈন্যদের কানেও পৌঁছে যায়। তাঁরা এ গানকে তাঁদের নিজেদের করে নেন। এমন কি স্ট্রাসবুর্গ রেডিওর জার্মান প্রোগ্রামে এটির সুর বাজানো হত।"

আরো অনেক গান শিবিরে তৈরি হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে ইয়ারোশ্লাভ বার্টল এবং ইরিজাক-এর রচনাগুলি। হান্স ইয়ুর্গেন বার্টেলস-এর ভাষায়—

"এই গানগুলি ছিল পশুর মত অত্যাচার আর ঠাণ্ডা মাথায় খুনের বিরুদ্ধে মানবতার আদালতে অভিযোগ এবং একই সঙ্গে দুর্দমনীয় সংগ্রামী মনোভাব আর মাতৃভূমির প্রতি অন্তহীন ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।"

শুধু ইয়ারোশ্লাভ বার্টল এবং ইরিজাক নন, আরো অনেকেই সংগীত রচনা করেছেন যার মধ্যে খুব উঁচু মানের কিছু কাজ ছিল এবং এর সবই গভীর এক মনুষ্যত্ববোধ ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা আর শ্রদ্ধার প্রকাশ, বুখেনওয়াল্ডের পটভূমিতে যেন মানবতার এক আশ্চর্য স্মৃতিফলক।

এইসব রচনা বন্দীদের সেই অসহায় ও নারকীয় জীবনে কী আশ্চর্য ও সঞ্জীবনী ভূমিকা পালন করত তা মনে করেছেন অনেক প্রাক্তন বন্দী, নানা জাতির, নানা ভাষার। এমনি একজন, ওয়াল্টার ওলফ, লিখেছেন—

"এটসবার্গ পাহাড়ের শিবিরে—পরবর্তীকালে যাকে বুখেনওয়াল্ড শিবির বলে পৃথিবী জেনেছে—নাৎসিরা চেয়েছিল আমাদের মানবসত্তাকে নিঃশেষে গুঁড়িয়ে দিতে। শুধু আমাদের শরীব নয়, আমাদের চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের মনুষ্যত্ব, সবকিছুই ছিল বন্দী। এস এস-এর অচিন্তনীয় নির্মমতায় আর অত্যাচারে আমরা দিশেহারা, প্রতি মুহূর্তে সন্ত্রস্ত। খাদ্য কখনো যথেষ্ট পরিমাণে জুটত না, ঘুম সব সময়ই হত বড্ড কম, পরিশ্রমের সীমা ছিল না কোনো, অত্যাচার আর নিপীড়ন ত ছিলই আর ছিল প্রতিক্ষণের সঙ্গী মৃত্যুভয়। আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনারই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুভয়। কী করে এস এস-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকব, এই দুর্ভাবনা ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী···

"আমার মনে পড়ে···

"চরম দুর্দশার সময় তখন। ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শক্ত পাথর ভাঙার কাজ, সকাল থেকে রাত নামা পর্যন্ত একটানা। হাত-পা কেটে ছিঁড়ে ফেটে একাকার। তা সত্ত্বেও সমানে চলছে দাস শ্রমিকের ওপর দাবি, আরো কাজ করো, আরো বেশি কাজ করো। এক রবিবার সন্ধ্যায় অল্প কিছুক্ষণের বিশ্রাম পেয়েছি। শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে কোনোরকমে শিবিরে ঢুকলাম। শরীর ভেঙে পড়ছে, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ একেবারে হঠাৎই, ভেসে এল সুর, এক নম্বর ব্লকের ছাদের ওপর বাঁধা লাউডস্পীকার থেকে। কোনো এক চেম্বার মিউজিকের সুর।··· সংগীত··· আহ··· আরো একবার সংগীতের ধ্বনি! স্মৃতির পর্দায় কী যেন একটা ভেসে উঠতে চায়··· কত কিছু ভেসে ওঠে। আমাদের সেই অন্তহীন হতাশা আর অসহায়তার মধ্যে চেতনার অবশ শরীর ভেদ করে কী যেন একটা বিঁধে যায় মনের গভীরে। আশ্চর্য এক অনুভূতি। বড় যন্ত্রণা আর আকুলতার অনুভূতি। আমি যেন পালিয়ে গেলাম, উধাও হয়ে গেলাম।··· সংগীত। হতাশা আর লাঞ্ছনাবোধ অস্তিত্বের এমনই এক তলদেশে আমাদের নিয়ে গেছে, দুর্দশার অনুভূতি এমনই তীব্র যে সংগীতের সুরের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠা বোধ যন্ত্রণা হয়ে ওঠে, অসহ্য যন্ত্রণা, যন্ত্রণার কষ্ট যেন শারীরিক হয়ে ওঠে।"

দিনকয়েক পরে···

"এক শনিবারের কথা। তেইশ নম্বর ব্লকের কমরেডরা বসে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ কে যেন গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন গানের একটা কলি। আড্ডা থেমে গেল। গান যেন রোগ, ছড়িয়ে পড়ল সবার মধ্যে। কেউ কেউ গাইলেন তাঁদের কৈশোরের গান। এমন কিছু নয়,

তেমন আবেগটাবেগেরও ব্যাপার নয়, শাদামাটা গান। কাটা কাটা কথায় ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন। জানলা দিয়ে হঠাৎ ভেসে এল এস এস-এর হুংকার। আমরা থেমে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার গাইতে আরম্ভ করলাম, খুব আস্তে আস্তে, নিচু গলায়। যেন নিজেদের গলার স্বরেই আমরা খুঁজে পেলাম আমাদের সাহস। খুব আস্তে, কান-খাড়া-করা কুকুরগুলো যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে আমরা একসঙ্গে গাইলাম—

> তারপর মুর ফৌজের দল
> আর বেলচা হাতে
> জলাভূমিতে কাজে নামল না
> না…না…না…

"এটা কোনো সুর নয়, এটা আশা, এটা বেঁচে থাকা। এটা যেন হয়ে উঠল আমাদের বিশ্বাস। ওই গানটাই যেন আমাদের টেনে নিয়ে চলল, আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখল সোজা করে। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে, সেই নিদারুণ দুঃসময়ে, বুখেনওয়াল্ডে বিড়বিড় করে আওড়ানো ওই কটি শব্দ আমাদের শক্তি দিয়েছিল, ভবিষ্যতের ওপর, স্বপ্নের ওপর, জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখার শক্তি।

"আশা আর বিশ্বাসের শক্তি যোগানো এমনি একটি গান। এটি লিখেছিলেন ইয়ারোস্লাভ বার্টল, সুর দিয়েছিলেন ইরি জাক।

যখন শৃংখল ভাঙবে

> হাজারে হাজারে নিরাশ হয়েছে বেড়ার
> পেছনে
> রেহাই দাও, রেহাই দাও
> করেছে করুণ প্রার্থনা।
> ছায়ার মতন মানুষ এখন এখানে ওখানে
> মেঘলা চোখের দৃষ্টি উধাও
> দেখেও দেখে না কীসব ঘটছে
> আকণ্ঠনীল যন্ত্রণা।
> বহু বছরের দাসত্ব যেন হাতের রাখী
> ক্ষুধাকে জেনেছি, জেনেছি তৃষ্ণা,
> বিষনিশ্বাস
> মৃত্যুর সাথে করেছি বাস।
> দুঃসহ এই জীবনে ঢালবে কালচে বিষ
> নিঃশেষ সেই বিশ্বাসঘাতী গুপ্তচর।
>
> দিন এসে গেছে
> ওহে জল্লাদ, হাত জড়ো করো
> কেঁপে ওঠো ভয়ে
> উঁচু এই হাত শক্ত মুঠিতে মেটাবে ঋণ
> মেটাবে তোমার সমস্ত দেনা।

ভাঙবে যখন আমাদের এই লোহার শেকল
কোনো বুজরুকি তোমাকে বাঁচাতে আর
পারবে না
খুব কাছাকাছি এসে গেছে জেনো আমাদের
দিন।
ভাইয়েরা আসছে দূর দূর থেকে
পৃথিবী কাঁপিয়ে,
হাতে হাত রেখে পাহাড়ের মত
দাঁড়াবে যেই
আগুন জ্বলবে
দাবানল যেন, দিগন্তময়
রাতের আঁধারে জ্বলজ্বলে শত তারার
মত।
দিন এসে গেছে
ওহে জল্লাদ, হাত জড়ো করো
ভয়ে কেঁপে ওঠো।

এসে গেছে দিন
বেড়ার পেছনে হাসির দিন
কান পেতে শোনো দ্রিম দ্রিম বাজে
সময়ের সুখ,
চেয়ে দেখ ওই বেড়ার পেছনে
গর্বিত মুখ।

দিন এসে গেছে
ওহে জল্লাদ····

ওয়াল্টার ওলফ আরো লিখেছেন—
"মনে পড়ে···

"আরো এক রবিবার। মার্চের রৌদ্রে ধোয়া দুপুর। এক কমরেড বের করে আনলেন তাঁর বেহালা। তিনি বাজাতে লাগলেন, আমরা গাইতে থাকলাম আমাদের গান, বুখেনওয়াল্ড-গীত। আমাদের জন্যে লেখা, আমাদের নিজেদের গাওয়া গান। এমন গান যা ফিরিয়ে দেবে আমাদের আশা, সাহস আর বীরত্ব। এস এস দস্যুর দল এই গানকেই ব্যবহার করত তাদের রুচির বিকারে, তাদের কুৎসিত ঠাট্টায় আর সন্ত্রাস ছড়াতে। 'আরও জোরে, আরও একবার গাও'—গর্জন করে উঠত পশুর দল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠাণ্ডায় জমে যেতে যেতে আমরা গাইতাম এই গান। তবু মনে হত, এ আমাদের নিজেদের গান। মনে হত, তোমরা যেমন আমাদের বাধ্য করছ গান গাইতে, আমরাও তোমাদের বাধ্য করছি গান শুনতে, আমাদের গান শুনতে।

"স্মৃতি চলে যায় পেছনে হেঁটে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে যুদ্ধের প্রথম শীতের কথা। ক্ষুধার্ত মানুষ। শিবিরে খাদ্য বলতে শুধু জল আর কপির পাতা সেদ্ধ। তারই মধ্যে এল

মহামারী। টাইফয়েড। আর আছে প্রতিদিন খুন—এস এস-এর হাতে।...একুশ জন সেরা ইহুদি বন্দীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল ওরা। আমাদেব বুক ভেঙে গেছে। বুকের হাড়গুলো যেন গুঁড়ো হয়ে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত শরীরটাকে টানতে টানতে ফিরে এলাম কাজ থেকে। টলতে টলতে গিয়ে পৌঁছলাম ঘুমনোর হলে, বাংকের সামনে। বাংকে উঠে হাতের ভাঁজে মুখ গুঁজে দিতেই কানে ভেসে এল সুর। দূর থেকে ভেসে আসছে শুবার্টের সুর। তাঁর অসমাপ্ত সেকেন্ড সিমফনি। আমার ছোট্ট, সরু বাংকে ঘাড় গুঁজে, চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। আশ্চর্য সুর! বুকের ভেতরে, কোন অতলে পৌঁছে কী অনুভূতি যে সৃষ্টি করে! বুক জুড়ে কী যন্ত্রণা থাকলে, কোন আনন্দের কেমন ভিখারি হলে মানুষ সৃষ্টি করতে পারে এমন সুর! শুবার্ট করেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ থেকে যায় এ সুর। কিন্তু বুখেনওয়াল্ডে সেদিন এই অসমাপ্ত সুরই মৃতপ্রায় আমাদের দেহে মনে নবীন জীবনের স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়েছিল।

"স্মৃতির পর্দায় আর একটি ছবি। অন্য এক সময়। শিবিরে তখন ক্ষণস্থায়ী, অপেক্ষাকৃত সুসময়।... একটি ডাবল কোয়ার্টেট এবং আরো একবার মোৎসার্ট। মোৎসার্টের 'লিটল নাইট মিউজিক'। এ সুরটি আমাদের যে কীভাবে উৎসাহ দিত, বারবার, নানা পরিস্থিতিতে। এটি যেন আমাদের অন্তরে জাগিযে তুলত দীপ্ত এক জীবনীশক্তি। সেই শক্তির ওপর নির্ভর করে আমাদেব ভেতবে গড়ে উঠেছিল লড়াইয়ের এক অদম্য মানসিকতা, ফ্যাসিজমেব বর্বরতা আর অন্ধকারের কুৎসিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়েব মানসিকতা।... মোৎসার্টের এই সুবটি চিরকাল জড়িযে থাকবে আমাদের লডাইয়ের সঙ্গে এবং শেষ লড়াইয়েব পর বুখেনওয়াল্ড বন্দীশিবিবে আমাদের জযের সঙ্গে।

"'লিটল নাইট মিউজিক' আমাদের হৃদয়ে আরো একটি কারণে·

"১৯৩৮-৩৯-এর শীতকাল। শিবিরে সময় কাটছিল অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে। দারুণ প্রতিকূলতাব মধ্যেই ইহুদি কমরেডবা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যোগাড় করতেন। সাঁইত্রিশ নম্বর ব্লকে একটি কোয়ার্টেট বাজাতেন তাঁরা। প্রায়ই তাঁরা আমাদের শোনাতেন 'লিটল নাইট মিউজিক'। কান পেতে শুনতাম আমরা আব স্বপ্ন দেখতাম। মৃত্যুশিবিব ঘিরে ওই কাঁটাতারেব বেড়ার ওপারে মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন, আমাদের ঘরেব স্বপ্ন।... মোৎসার্ট আমাদের হাত ধরে নিযে যেতেন এক কল্পলোকে যেখানে আমরা আবার হয়ে উঠতাম মানুষ।

"যত ক্ষণস্থায়ী হোক, সুখ কি সয়, মৃত্যুর শিবিরে? কথাটা পৌঁছে যায় এস এস-এব কানে। তাদের কম্যান্ডাব খেপে ওঠে। 'নীচ ইহুদিবা' মহৎ আর্য সংগীত চর্চার স্পর্ধা দেখিযেছে। পশুরা ঝাঁপিযে পড়ল। প্রত্যেক ইহুদি বন্দীর কপালে জুটল পঁচিশ ঘা করে চাবুক।· জানি না আমাদেব সেই সংগীতপাগল, মানবদরদী ইহুদি বন্ধুরা বেঁচে আছেন কিনা। সম্ভবত তাঁদের খুন করা হযেছে ডাখাউ-এ, মাইডানেক-এ আউশউইৎস-এ হয়ত বুখেনওয়ালেন্ডই, আরো অসংখ্য হতভাগ্যের মত।... হে আমার হতভাগ্য বন্ধুরা, আমরা যাবা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, যারা পারি নি ওই পশুদের হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে, তোমাদেব কথা মনে করি। প্রত্যেকবার, যখনই কোথাও 'লিটল নাইট মিউজিকের' সুর বেজে ওঠে, আমবা মনে করি তোমাদের কথা, তোমাদের ত্যাগ আব বীবত্বেব কথা আর জীবনের কথা—

"তোমাদেব, আমাদের, সকলের জীবনের কথা।"

বুখেন ওয়াল্ড

ফ্রানৎজ হাকেল

কোনো পাখি শিস দেয় না
এই মৃত বনে,
কুয়াশা আমাদের সারা দেহ ভিজিয়ে দেয়।
দৃষ্টিহীন রাত্রি
ধূসর রঙের দিন
কোথায় একটি শিশু ?
কোথায একটি নারী ?
কালো বুখেনবনে
শুধু বাতাসের আর্তচিৎকার
আর গোঙানি,
ভাইমাবের পাহাড়ে তুষার নাচে
ঝড়ের বুকে
ওযাচটাওয়ার থেকে কালো মৃত্যু মুচকি হাসে।
রোলকলেব লাইনে শীতে কাঁপছে
বার হাজার মানুষ
মাইক্রোফোনে নেকড়ের চিৎকার
ন্যাড়া মাথার ওপর দাপাচ্ছে
উন্মাদ শীতের ঝড
ওয়াচটাওয়ার থেকে কালো মৃত্যু খুশিতে হাসছে।
আমাদেব মধ্যে কোনো অনুভূতি নেই
কোথায় নিয়ে যাব এই অশ্রু
এই পাহাড়ের বুকে
এই সময়ে ?
কালো বুখেনবনে ঝড়েব ঝাপটায
সাফ হয়ে যায়
কুয়াশার টুকরোগুলো
যেন ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে কেউ
ওয়াচটাওযার থেকে কালো মৃত্যু ঠোঁট টিপে হাসে।
রোলকলের মাঠে নম্বর ডাকা হচ্ছে
কোনো নাম নয়, এবং
আজ সকালেও যে ছিল
সন্ধ্যাবেলায় হয়ত সে নেই
সে অতীত, সে বিস্মৃত
কারণ ওয়াচটাওয়ার থেকে কালো মৃত্যু হেসেই চলেছে।
হে মিত্রগণ, হে কমরেডরা
আমরা সবাই বিস্মৃত মানুষ

তবু আমরা এক একজন
ভাইমারের পাহাড়ে এক একটা ঘণ্টা
আমরা বেঁচে আছি আজও, এখনও
এখানে বেঁচে থাকাটাই বীরত্ব ।
আজকের দিন তাই বীরত্বের দিন
যখন ওয়াচটাওযারে কালো মৃত্যু মুখ টিপে টিপে হাসে ।

শীত, ১৯৪১

আমাদের পথ

ইযাবোস্লাভ বার্টল

মুখেব ওপব পড়েছে
সূর্যেব উজ্জ্বল আলো,
আমাদেব বন্ধুদেব মুখের ওপর
আমাদেব দুর্ভাবনার মুখের ওপর ।
আমাদের হৈ হৈ হট্টগোল
জাগিযে তুলছে বিশ্বকে
তুমুল কলরবে, দ্রুত
সুন্দব এক আগামী কালের জন্যে ।
তবে আব কিসের বাধা
বিভেদ সৃষ্টি করে কে
বেসুর কেন টুকরো করে আমাদের ?
আমাদের কষ্টগুলো তো এক
একই সূর্যের আলো ছুঁয়ে যায় আমাদের !
তবে কেন…
মুছে যাক এইসব সীমারেখা
যা কিছু আমাদের ভাগ করে
টুকরো করে
মুছে যাক, কারণ
ঘনিয়ে আসছে সেই মুহূর্তটি
যা আমাদের
সম্পূর্ণ আমাদের !
একটু একটু করে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি
আমাদের সূর্যের কাছে
আমাদের স্বাধীনতার কাছে ।
স্বাধীনতা,
আহা, সোনালি স্বাধীনতা
শান্তি
আহা, চিরন্তন শান্তি,

দুহাত ভরে দেয়, শুধু দেয়
জানি, নিশ্চিত জানি
সে জীবন ছেয়ে থাকবে আনন্দ
কোনো যুদ্ধ আর ফেলবে না কালো ছায়া
পুরনো পথ পড়ে থাকবেই আস্তাকুঁড়ে ।
মেঘ ভেসে যাবে ঝোড়ো বাতাসের টানে
আমাদের জীবনের সোনালি ঝলকে
রিমঝিম গানে
ভরে যাবে পৃথিবীর বুক ।
শির শির করে উঠবে আমাদের হৃদয় ।
ঈর্ষা
মুছে যাক !
এগিয়ে চলা
প্রতিদিন
প্রতিক্ষণ
শুধু এগিয়ে চলা
আগে, আরো আগে, ক্রমাগত
আর তাতেই সুখ,
বড় কাছে ।
খুব কাছাকাছি· ·
সমস্ত সীমারেখার···

১৯৪০
চেক থেকে জার্মান রূপান্তর
থিওডোর হ্লাউশেক

রুডি আর্নড্-এর জন্যে

হাসো গ্রাবনার

এই যে এখুনি পাশ দিয়ে চলে গেল
স্ট্রেচারে বেহুঁশ
হাসপাতালের দিকে,
ও-ও ছিল ঠিক তোমার আমার মতই
সাড়ে তিন হাতের আস্ত একটা মানুষ ।
স্ট্রেচারবাহক দু-জনেরই জানা আছে
ও বাঁচবে না
বড়জোর আর কিছুক্ষণ,
দু-জনেই তাই ধীর পায়ে হাঁটে
প্রতি পায়ে আঁকে চুম্বন ।

শিসের গরম দুটো গুলি ওর শরী
বুক-পিঠ এফোঁড় ওফোঁড ।
আজ যে ওকে মরতে হবে
জানা ছিল ওর কালই ।
গোপন অশ্রু
চারপাশে ফিসফাস
নীবব প্রার্থনা
দাঁতে দাঁত চেপে অভিশাপ ।
চোখেব জলে বোনা হচ্ছে
ঝলমলে কাফন
কমবেডেব লাশ ঢাকতে হবে ।

সামনে তাকাও, এগিয়ে চলে

ইয়ারোসাভ বার্টিল

সামনে তাকাও
এগিয়ে চলো
ফিরে যাওয়ার রাস্তা নেই—
হ্যাঁ, শুধু সামনে
শুধু ঊর্ধ্বে
দূরে, নীল আকাশেব দিকে ।
বিপুল এ বিশ্ব
নাতিশীতোষ্ণ তার ভাগ্য
মৃদু নিশ্বাস ফেলে বযে যাওযা হাওযা
অস্ফুটে ভেসে যায় !
দেখিযে দাও, তুমিই তোমাব মালিক
তোমাব জীবনেব প্রভু !
সুদূব পিতৃভূমিব স্বপ্ন, স্বপ্নেব মায়া
কোনো কাজে লাগবে না ।

শুধু এগিয়ে চলো
তাতেই পাবে শক্তি
বিপদকে পায়ে পায়ে দলতে
শুধু সাহসীরাই পারে,
এগিযে চলো,
আপন ধ্রুব তারার দিকে চোখ ।
বাতাস যদি দাঁত খিচোয
প্রকৃতি ভয় দেখায

সামনে খোলা থাকবে পথ
সরব না এক পাও
মুক্তি আর শান্তি—
তাই আমাদের পুরস্কার ।
হাড় জ্বালানো গরম
হাড কাঁপানো শীত
অভাবের আর সহস্র ক্ষত শতেক
অস্ত্র দিয়ে আমাদের মারছে
কাঁটাতারের বর্বরতা ।
আমাদের স্বাধীনতাব সূর্য অস্ত যেতেই
শুরু হলো অত্যাচারের রাত্রি ।
এগিয়ে চলো
এখনও যখন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে
ভাল-মন্দ সব কিছুর ওপর ;
সময় আসছে—
নগদ মূল্যে শোধ দিতে হবে সমস্ত ঋণ
ধুয়ে দিতে হবে সমস্ত পাপ ।
আগামী দিন যেন ঢাকা আছে
নিয়তির মুঠোয়,
আর নিয়তিও নতমুখ আমাদের শক্তির কাছে ।

ফুটফুটে সেই আগামীকালের জন্যে
এই আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু,
কালরাত্রির বুক থেকে ছিঁড়ে আনতে
কালকের ভোর,
উজ্জ্বল এক ভোর
পারে শুধু যার বুক বাঁধা আছে সাহসে !

চেক থেকে জার্মান রূপান্তর থিওডোর হ্রাউশেক
সুরারোপ ইরি জাক (১৯৪০)

ছোটদের রূপকথা

ফ্রিৎজ লোহ্‌নার বেডা

এক দেশে এক ড্রাগন ছিল,
ছিল বিকট হাঁ,
বাঘের মতন দাঁত ছিল তার
ঘোড়ার মতন ক্ষুর ।

খাই খাই তার খিদের আগুন
পেটে সারাক্ষণ

ফেললো গিলে আস্ত আস্ত শহর
চিবিয়ে খেল দেশ
(আর) চুষেই নিল জাতি
খাই খাই তার যায় না তবু
এমনি খিদের বহর ।

সকালে খায় রাত্তিরে খায়
খায় সারাদিন ধরে,
দাঁত খিঁচিয়ে কড়মড়িয়ে খায়,
খাচ্ছিল তো বেশ
খেতে খেতে পেটটা ফেটে
মরল শেষমেষ ।

হাসপাতালে

ফ্রিৎজ লোহ্নার বেডা

ওইখানে মিশে আছে তারা
শাদা বিছানায়,
নিঃশব্দে ছটফট করে
সারা ঘরে
একটি নিশ্বাস ।
সব চোখে দ্বিধা আর ছায়া
গভীর স্বপ্নের ।
স্বপ্নে কি দেখে তারা ?
রুটি আর সিগারেট
এখানে এখন দিন, চারপাশে আলো
অস্থির বাতাসে তবু শেকলের শব্দ ভেসে আসে
ওপারের শিবির থেকে ভেসে আসে আর্তনাদ
মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে বাড়ি, বনপ্রান্তে,
যেন শীত, খুব শীত ।
জানলার ওপারে হীরে ঝিকমিক করে
রোদ পড়ে গাছের বরফে
মৃত্যু তবু করাঘাত করে, শক্ত কাঠে
যখন তখন ।
শাদা জামা পরা ঋজু দেহ ওই মানুষটি
বাঁচা মরা তাঁর সমস্ত কিছুই রোগীর জন্যে
হেঁটে চলেছেন মুখে হাসি নিয়ে সহানুভূতির
দুই কাঁধে বোঝা, হিমালয় ভার,
বোঝাই দায়,

মুখে হাসি নিয়ে হেঁটে চলেছেন হালকা পায়ে।
নিয়তির এই খেলা বিশ্ব কি দেখেছে কোনোদিন
ওইখানে পড়ে আছে জ্বরাতুর, যন্ত্রণাকাতর
আতঙ্কের চাবুকে থরোথর
তবুও সে স্বপ্ন দেখে গোপনে, রঙিন,
সুস্থ হবে
মুক্ত হবে
ফিরে যাবে বাড়ি
একদিন।

পলাতক

ফার্ডিনান্ড বোমহিল্ড

মশাইরা সব খেপে আগুন,
হতেই পারে কারণ সে
দেখাচ্ছিল বুড়ো আঙ্গুল সবাইকে।
আবার তাকে ধরে এনে, আড়াই দিনে,
খাঁচায় ভরে রেখেছে
এবার নাকি বিচার হবে।

খাঁচা থেকেই পালিয়েছিল রাত গভীরে
পাখির মতন,
বসন্ত কি ডেকেছিল গাছের ছায়ায়,
পাহাড়মাথায়, নদীর তীরে
আকুল করে!
বলছে সবাই
হবে এবার দারুণ পেটাই,
পেটাই শেষে ঝুলতে হবে
ফাঁসির কাঠে।
বসন্ত খাও!

এমনই তার আহাম্মকি
শীতও করে খিদেও পায়,
ছেঁড়া পাতলুন বাসি রুটি
তাই হাতায়।
মশাইরা সব রেগেই কাঁই
একে পলাতক তার ওপর
হাত সাফাই,
মানসম্মান নেই নাকি!

গায়ের জামা কুটিকুটি
বেল্টে বাঁধা হাতদুটি
চাবুক পড়ে, রক্ত ঝরে
রক্তে ভেজে ডাণ্ডা,
দৃশ্য দেখে বুকটি ভরে বাবুদের রাগ ঠাণ্ডা।
দোষের কি যে রাগ হবে
এই ঝামেলা এই অপমান
মশাইরা সব মালিক যে !
সেই মালিককে অস্বীকার,
নিয়ম ভেঙে স্বপ্ন দেখা স্বাধীনতার !
ওই ব্যারাকে চলছে সেই
পেটাই বিচার একসাথেই।
চামড়া ফাটে, মাংসে দলা,
ভাঙছে হাড়, চক্ষু গলা,
কী-ই বা তাতে যায় আসে
মানুষ তো নয়, কুত্তাও নয়
হতচ্ছাড়া একটা কিছু।
মশাইদের তো মেজাজ খুশ
স্বাধীন মাথা হচ্ছে নিচু।

কী অদ্ভুত, তবুও দেখ সময় যায়,
রাত্রি আসে।
বাতাস জুড়ে গোঙানি আর কান্না ভাসে
আকাশ ভরে তারাও জ্বলে
কী উজ্জ্বল,
এমন আলো পায় কি তারা অশ্রুজলে ?

ক্রিমেটোরিয়মের চুল্লী

ব্রুনো আপিৎজ

হয়ত তোমরা পারো আমাদের ধুলোয় মেটাতে
এই শরীরটাকে জ্বালিয়ে ছাই করতে
তাও হয়তো পারো
তবু আগামীকালের বিচারে
পার পাবে না তোমরা
পালিয়ে বেড়াতে পারবে না চিরকাল।

আমাদের স্তম্ভিত নীরবতার উষ্ণ ধোঁয়া
আকাশের বুক ছুঁয়ে দেয়

অন্তহীন তোমাদের হত্যালিপ্সা
কিন্তু এই রাত্রি যে সাক্ষীতে ভরা...

একটি স্ফুলিঙ্গও হারিয়ে যাবে না
যা বেরচ্ছে তোমাদের চুল্লী থেকে
অযুত চোখ দেখছে
অযুত কান শুনছে
পোড়ার আওয়াজ আর আগুনের আঁচ...

তোমাদের আদেশ মানছে না ওই স্ফুলিঙ্গ
ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রি আর নীরবতার বুকের ভেতরে
ঢুকে পড়ছে আমাদের হৃদয়ের গহনতম কোণে
আগুনটা থেকেই যাচ্ছে।
অযুত হৃদয় জ্বলছে।
যে হৃদয় এখনও আমরা ঢেকে রেখেছি দু-হাতে
এই মৃত্যুমোমবাতির উজ্জ্বল শিখা
একদিন চেপে ধরবে এই রাত্রির টুঁটি
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে উদ্দাম আগুন।
আমরা আমাদের পায়ের বেড়ি, হাতের শেকল
টেনে নিয়ে যাব, যেন এক দৈত্য,
দেশে দেশে, নগরে নগরে।
মরণচুল্লী থেকে প্রতিশোধ নিই
মুছে দিই লালসাব দাগ
মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে দাহ করি তাকে
বিশ্বকে যে শ্মশান করেছে।
আর তখন
চড়মড় করে ওঠে আমাদের পবিত্র আগুনের আঁচ
খুনিরা টের পায় আমাদের ক্রোধ আর ঘৃণার তাপ
কুঁকড়ে যায়, পুড়ে মরে।
হিসহিস আওয়াজ
সেই আগুনের শিখা
তোমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়
পৃথিবীটা তোমাদের জন্যে বড়ই ছোট
সব দেশই তোমাদের তাড়ায়
থুতু দিয়ে
ঘৃণা দিয়ে।
সেই ক্রোধ আর ঘৃণার অগ্নিশিখা
এই রাত্রে
ওই মরণচুল্লীর দিকে তাকিয়ে
ঘোষণা করছে...

হে আমার মৃত ভাইয়েরা,
তোমরাই আমাদের প্রজ্জ্বলিত করেছ ।
আর মৃতরা ফিরে আসতে লাগলেন···

স্বপ্ন

অজ্ঞাত বুখেনওয়াল্ড বন্দী

রবিবার আজ
বসন্তের উজ্জ্বল মেঘ
ভেসে যায় গাঢ় নীল আকাশের বুকে ।
উদাসীন বিষাদের মত
পড়ে থাকি ঘাসের ওপর
চোখ বুজে অনুভব করি
মৃত্যুহীন জীবনের স্রোত
বয়ে যায় শিরায় শিরায়
আর বয়
বসন্তের ব্যথার বাতাস ।
তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে,
একবার, শুধু একবার···
ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে, তৃষ্ণা হয়ে
আমাকে আকুল করে তোলে
অসহায়, একা একা ।
তখন আকাশ জুড়ে ছবি আঁকি
পরপর, অবিরাম ।
অকস্মাৎ ছবিগুলি
যেন প্রাণ পেয়ে
আমার ভেতরে ঢুকে পড়ে
ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গে ছড়ায়
রক্তের কণায় কণায় ।
কষ্ট হয়, বুকে ভার জমে
বাতাসে যেন আর বাতাস নেই ।
তখন তোমাকে
দেখার আকুল ইচ্ছা···
একবার, শুধু একবার···
তখনই দমকা হাওয়া
উত্তর ভুবন থেকে এসে
ছবিগুলি ছিঁড়ে ফেলে
কুটিকুটি করে
কোথায় যে ফেলে দেয় ছুঁড়ে ।

এত করে আঁকা ছবিগুলি
তারাও পালিয়ে যায়।
এত মেঘ দিয়ে সারাদিন ধরে
কার ছবি আঁকো ?
তোমার নরম গলা কানে ভেসে আসে
হাসিটাও দেখে ফেলি যেন।
আমি তো উত্তরহীন
পেট পিঠ এক করে
শুয়ে থাকি ঘাসের ওপবে,
চিৎ হয়ে।
অথচ তোলপাড় ইচ্ছা
সারা বুক জুড়ে,
ওকের মতন উঁচু
পাহাড়েব মতো শক্ত হয়ে
মাটিতে দাঁড়িয়ে
আকাশে দু-হাত তুলে বলি,
তোমাব, তোমার আব
আব এক প্রিযার—
স্বাধীনতার।

ঘরে ফিরে

কার্ল স্নগ

অমন করে আমার দিকে তাকিও না, বউ,
অমন খুঁটিযে খুঁটিযে
আমার মুখ দেখো না
আমিই এসেছি, আমি
তোমাব স্বামী
না, তোমার চোখ ভুল দেখছে না

জানি, আমাকে কেমন অচেনা মনে হচ্ছে
অদ্ভুত লাগছে আমার চলাফেরা, হাবভাব
দুঃখের পথ বেয়ে
যন্ত্রণার ভেতর দিযে
কতবার আমি মৃত্যুর চুল ছুঁয়ে হেঁটে গেছি।

অবশেষে ঘবে ফিরলাম।
তবু আমাদের সুখ আমরা ঢেকে রাখব

কারণ, বউ,
বসে থাকলে চলবে না,
আমাদের সন্তানদের জন্যে শুরু করতে হবে সংগ্রাম।

মিথ্যে বলব না
অনেকবার আমার মনে হয়েছে
অনেক তো হল, এবার বিশ্রাম
এবার একটু শান্তি।
কিন্তু কেমন করে বিশ্রাম নেব
কোথায় পাব শান্তি
ঘৃণা এখনও ল্যাজ আছড়াচ্ছে হিস হিস শব্দে
ভয় দেখাচ্ছে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে
শাসন করছে প্রবল প্রতাপে এখনও।
কোথায় মুক্তি কিসের সুখ
শান্তিও নেই মুহূর্তের
অত্যাচারীর শেষ রাজত্ব কবরে যাক,
তারপব সব।

সেই জন্যেই বউ
আমি মাথা নিচু কবি না,
দোহাই তোমার, একবারও বলো না "তুমি আমার কথা ভাবো না
আমাব স্বাধীনতা আমি সেদিন উপহার পাব
যেদিন আমি পৃথিবীকে উপহার দিতে পারব "স্বাধীনতা"।

মৃতদের জন্য কোরাস
ফার্ডিনান্ড রোমহিল্ড

রাত্রির আকাশ চিরে গনগনে আগুনের রেখা
অস্থির দুহাতে খোঁজে
অন্ধকারে
গহন গভীরে।
মৃত্যুর মশাল ওই বেখা
মৃত্যুর আগুন-নির্দেশ,
আগুন তো নিষ্পাপ, নির্মোহ
কি অদ্ভুত সোনা হয়ে জ্বলে
লকলকে মৃত্যুর মিনার।

মরণের চুল্লী জ্বলে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ তেজে,
সে আগুনে

ওদের হাতের শব শেষ শান্তি পায়
আগুনের বুকের ভেতরে ।
প্রতি রাত্রে প্রেতের মেলায
চোখপালটাযে হাসে,
মৃদু হেসে সম্মতি জানায় .
চোখ বোজে নিশ্চিত বিশ্বাসে
ওদের পাপের কোনো সাক্ষ্য নেই,
ওদের পাপের কোনো চিহ্ন থাকবে না ।
যেহেতু জানে না
আলোব দ্যুতিবও বুক হতে
শব্দ ওঠে,
আলোর অন্তর ভেসে যায়
শঙ্খেব অমোঘ ধ্বনিতে,
কোনো পাপ লুকোনো থাকে না ।

স্ফুলিঙ্গের তীব্র তীক্ষ্ণ সুর শোনো নি কি ?
কান পাতো,
আগুনেব শিখা গান গায় ।
সেই গান এইমাত্র জন্ম দিল
একটি বীজের দানা
গাছের জ্বলন্ত ডানা থেকে ।
ফেটে যায়
ছিঁড়ে যায়
চিতার আগুন
স্ফুলিঙ্গে ছড়িয়ে যায়
আকাশে বাতাসে
যেমন শস্যের গোছা মাটি ফুঁড়ে ওঠে ।
আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে
চোখ বুজে সাড়হীন শুনি
পৈশাচিক সমবেত গান ।

আমাদের বুক থেকে
এ পৃথিবী হারাতে পারে না ।
সমস্ত ব্যথার দিনে
দুঃখের প্রতিটি রাত্রে
এ পৃথিবী আমাদের মা ।
অন্ধ যারা
অচেতন অথবা নির্বোধ,
কালচ্যুত ভাবে আমাদের,
ভাবে

মাটি ছুঁয়ে নেই আর আমাদের পা ।
পুনর্জন্ম ঘটে গেছে, দেখো,
ভস্ম ঝেড়ে নতুন উত্থান
পুরনো যুদ্ধের
নতুন সেনার দল ।
যে-মুহূর্তে আমাদের হাত
প্রাচীর ভেঙেছে
যে-প্রাচীরে বন্দী ছিল প্রাণ
কঠিন শৃঙ্খলে
আমাদের সমগ্র সত্তা জীবন্ত মশাল হয়ে গেছে
হয়ে গেছে আদর্শের প্রাণ ।
সব ব্যাধি সব ক্ষয়
ঝরে গেছে উকুনের মত
ঝড়ের আঘাতে ।

মরণ তো শেষ কথা নয়
মৃত্যুর জঠব থেকে বারবার জীবনেব শুরু,
মৃত্যুভেদ করে
এ পৃথিবী যৌবন পায় ।
আমরাই প্রথম সন্তান
আমরাই নির্বাচিত মুখ
আমরাই সেই সত্তা যার
নব অর্থে উদ্ভাসিত প্রাণ,
আমরাই এ বিশ্বকে প্রাণময় সঞ্জীবিত করি ।
আমাদের জন্ম হয অগ্নি থেকে
অগ্নিশিখা থেকে
আগুনের দ্যুতি থেকে
চিতার আগুন থেকে
রাত্রির গভীর বুক যে-আগুন আলোকিত করে ।